পদসঞ্চয়

শ্রীশান্তি দাস

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষাপর্ষৎ কর্তৃক অষ্টম শ্রেণীর জন্য অনুমোদিত
(১৯৫৫ সালের ২৪শে নভেম্বর তারিখের কলিকাতা গেজেট দ্রষ্টব্য)

পদসঞ্চয়

দ্রুত পঠনের (অষ্টম শ্রেণীর) উপযোগী

শ্রীশান্তি দাশ

প্রকাশ ভবন লিমিটেড
২০৮, বৌবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

প্রকাশ ভবনের পক্ষে
প্রকাশক—দুর্গাপদ ঘোষ
২০৮, বৌবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

সংশোধিত দ্বিতীয় সংস্করণ

মূল্য নয় আনা

মুদ্রাকর : শ্রীপ্রভাতচন্দ্র রায়
শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস লিমিটেড
৫ চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা-৯

সূচীপত্র

বিষয়			পৃষ্ঠা
বাল্মীকি	...	কৃত্তিবাস ওঝা	১
কৃষ্ণের বেশ	...	চণ্ডীদাস	৪
গোষ্ঠযাত্রা	...	জ্ঞানদাস	৫
প্রত্যাবর্তন	...	বলরাম দাস	৬
প্রার্থনা	...	আলাওল	৭
ধনপতির বিলাপ	...	মুকুন্দরাম চক্রবর্তী	৮
অর্জুনের লক্ষ্যভেদ	...	কাশীরাম দাস	৯
অন্নদার আত্মপরিচয়	...	ভারতচন্দ্র রায়	১১
ঝড়	...	ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত	১৩
সীতা ও সরমা	...	মাইকেল মধুসূদন দত্ত	১৪
হিমালয়	...	বিহারীলাল চক্রবর্তী	১৬
মাতৃস্তুতি	...	সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার	১৭
পরশমণি	...	হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	১৯
কুরুক্ষেত্র	...	নবীনচন্দ্র সেন	২১
শ্রাবণ	...	গোবিন্দচন্দ্র দাস	২২
ধূলা	...	গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী	২৩
চাহিবে না ফিরে	...	কামিনী রায়	২৪
মা	...	দেবেন্দ্রনাথ সেন	২৫
সন্ধ্যারাণী	..	অক্ষয়কুমার বড়াল	২৬
মুক্ত করো ভয়	...	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	২৭
পিলসুজের উপর পিতলের প্রদীপ		রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	২৮
প্রার্থনা	...	রজনীকান্ত সেন	৩২
নন্দলাল	...	দ্বিজেন্দ্রলাল রায়	৩৩

বিষয়				পৃষ্ঠা
কাজলা দিদি	...	যতীন্দ্রমোহন বাগচী	...	৩৪
দূরের পাল্লা	...	সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত	..	৩৬
পল্লী-জননী	...	কাজী নজরুল ইসলাম	...	৪০
মরুভূমি	...	কুমুদরঞ্জন মল্লিক	..	৪১
হাট	...	যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত	..	৪৩
মায়ের প্রতিমা	...	মোহিতলাল মজুমদার	...	৪৪
অনাবৃষ্টি	...	কালিদাস রায়	...	৪৫
জীবন-ভিক্ষা	...	করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়	...	৪৭
ফুলবাগান	...	সজনীকান্ত দাস	...	৪৯
ভাড়াটে কুঠি	...	প্রেমেন্দ্র মিত্র	...	৫১
রূপাই	...	জসীমউদ্দীন	...	৫৩
রামগরুড়ের ছানা	...	সুকুমার রায়	...	৫৪
কুটির	...	অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত	...	৫৬
সবার আমি ছাত্র	...	সুনির্মল বসু	...	৫৭
আত্মসম্মান	...	বনফুল	...	৫৯
সহায়	...	উমা দেবী	...	৬০
ভাইফোঁটা	...	অপরাজিতা দেবী	...	৬১
কেন মিছে নক্ষত্রেরা	...	জীবনানন্দ দাশ	...	৬৩
উষা	...	প্রমথনাথ বিশী	...	৬৪
ভগ্নপক্ষ	...	জগদীশ ভট্টাচার্য	...	৬৫
পদ্মা	...	হুমায়ুন কবীর	...	৬৫
স্বর্ণভস্ম	...	দিনেশ দাশ	..	৬৮
আগামী	...	সুকান্ত ভট্টাচার্য	...	৬৯

পরিশিষ্ট

কবি-পরিচয়

বাল্মীকি

চ্যবন ঋষির পুত্র নাম রত্নাকর।
দস্যুবৃত্তি করে সেই বনের ভিতর॥
একদা আরোহি' বৃক্ষে চতুর্দিকে চায়।
সন্ন্যাসিযুগল পথে দেখিবারে পায়॥
ভাবে মনে রত্নাকর লুকাইয়া বনে।
"সন্ন্যাসী মারিয়া বস্ত্র লইব এক্ষণে॥"
লোহার মুদ্গর তোলে বধিতে জীবন।
একজন জিজ্ঞাসিল—"তুমি কোন্ জন?
রত্নাকর বলে—"তুমি জান না আমারে।
লইব তোমার বস্ত্র মারিয়া তোমারে॥"
দ্বিজ বলে—"মোরে মারি' নাহি পাবে ধন।
করিয়াছ যত পাপ কহ সে এক্ষণ॥"
শুনিয়া কহিল দস্যু রত্নাকর হাসি'।
"মারিয়াছি তোমা হেন কতেক সন্ন্যাসী॥"
পুনঃ দ্বিজ বলে—"পাপ কর কার লাগি'।
তোমার এ পাতকের কেহ আছে ভাগী?"
রত্নাকর বলে—"যত ধন লয়ে যাই।
মাতা, পিতা, পত্নী, আমি,—চারি জনে খাই॥
যাহা কিছু বেচি কিনি—খাই চারি জনে।
আমার পাপের ভাগী সকলে এক্ষণে॥"

শুনিয়া সন্ন্যাসী হাসি' কহিলেন তবে।
"তোমার পাপের ভাগী তারা কেন হবে ?
করিয়াছ যত পাপ আপনার কায়।
আপনি করিলে পাপ আপনারি দায় ॥
জিজ্ঞাসা করিয়া ঘরে আইস নিশ্চয়।
তোমার পাপের ভাগী তারা যদি হয় ॥"
এতেক শুনিয়া বাণী চমকিত মন।
জিজ্ঞাসা করিতে ঘরে করেন গমন ॥
প্রথমে পিতার কাছে গেল রত্নাকর।
কহে—"পিতঃ! কহ এবে আমার গোচর ॥
মানুষ মারিয়া আমি আনি যত ধন।
তার পাপভাগী তুমি হও একজন ?"
পুত্রের বচন শুনি' কুপিল চ্যবন।
"হেন কথা তোমায় বলিল কোন্ জন ॥
মনুষ্য মারিতে তোমা বলে কোন্ জন।
তোমার পাপের ভাগী হব কি কারণ ?"
শুনিয়া পিতার বাক্য নত শির ক'রে।
কান্দিতে কান্দিতে কহে মায়ের গোচরে ॥
"সত্য করি' আজি মোরে কহ গো জননী।
আমার পাপের ভাগী হবে কি আপনি ?"
জননী কহিলা পুত্রে ফেলি অশ্রুধার।
"ছাড় পাপ-কর্ম, বাপু, না করিহ আর ॥
কত দুঃখে কত যত্নে পালিনু তোমায়।
তব কৃত পাপ বাছা, না লাগে আমায় ॥"

শুনিয়া মায়ের বাক্য মাথা হেঁট কৈল।
পত্নীর নিকটে গিয়া সকল কহিল ॥
"জিজ্ঞাসি তোমারে ভার্যে! সত্য করি' কও।
আমার পাপের ভাগী হও কি না হও?"
শুনিয়া স্বামীর বাক্য কহিছে রমণী।
"নিবেদন করি, প্রভো, শুন মোর বাণী ॥
মনুষ্য মারিতে কেবা বলিল তোমায়।
এই মাত্র জানি, তুমি পালিবে আমায় ॥"
শুনিয়া ভার্যার কথা রত্নাকর ডরে।
"কেমনে তরিব তবে, এ পাপ-সাগরে ॥
ডুবিনু কলুষে, মম কি হইবে গতি?"
কাঁদিতে লাগিল দুঃখে স্মরিয়া দুষ্কৃতি ॥
লোহার মুদ্গর নিজ মাথায় মারিয়া।
লুটায়ে পড়িল ভূমে অচেতন হৈয়া ॥
অনুতাপ-অশ্রুপাতে পাপ ধুয়ে গেল।
হৃদয়-মাঝারে তবে দিব্যজ্ঞান হৈল ॥
বহু বর্ষ তপ করে বসি একাসনে।
সর্বাঙ্গ ছাইল বল্মীকের কীটগণে ॥
হইল নিষ্পাপ-চিত্ত, গেল দুঃখভার।
'বাল্মীকি তপস্বী' নাম জগতে প্রচার ॥

—কৃত্তিবাস ওঝা

কৃষ্ণের বেশ

বেশ বনাইছে মায়।
চাঁচর চিকুর বনাই সুন্দর
চূড়াটি বাঁধিল তায়॥
ময়ূর-শিখণ্ড দিয়া তার 'পর
বিনি বায়ে দেখ উড়ে।
ফুলের সৌরভে অলিকুল যত
উড়িয়া উড়িয়া পড়ে॥
দু'দিকে দু'কানে কদম্বের ফুল
কি শোভা পেয়েছে দেখি।
নীলমণি যেন হেন লয় মন,
নবঘন কিসে পেখি?
কপালে মলয়- চন্দন-তিলক
তাহে গোরোচনা-ফোঁটা।
শ্রীমুখ ঝলকে যেমন অলকে
পূর্ণিমা-চাঁদের ঘটা॥
অধর-বান্ধুলি যেন রাতা গুলি[১]
কি জানি হিঙ্গুলে দলি।
নয়ন-চাতক তাহাতে কাজল
অতি সে শোভন ভালি॥

---

১ রাতা গুলি—লাল রঙের গুটিকা বা বড়ি।

বাহে[১] তাড়[২] বালা গলে বনমালা
কটিতে ঘুঙ্গুর বায়[৩] ।
করেতে মুরলী শোভে দেখ ভালি
রতন-নূপুর পায় ॥
চণ্ডীদাসে কয় নটবর-রূপ
সদাই দেখিয়ে থাকি ।
হেন মনে হয় নীল নবঘন
হিয়াতে ভরিয়া রাখি ॥

—চণ্ডীদাস

গোষ্ঠযাত্রা

সাজ সাজ বলিয়া পড়িয়া গেল সাড়া ।
বলরামের শিঙ্গাতে সাজিল গোয়াল-পাড়া ॥
হাম্বা হাম্বা রব যে উঠিল ঘরে ঘরে ।
সাজিয়া কাচিয়া সবে হইলা বাহিরে ॥
চারিদিকে সব শিশু মধ্যে রামকানু ;
কাঁচনি পাঁচনি কারু হাতে শিঙ্গাবেণু ॥
সবার সমান বেশ বয়স এক ছান্দ ।
তারাগণ বেড়িয়া চলিলা শ্যামচান্দ ॥

১ বাহে—বাহুতে (প্রাচীন বাংলায় 'বাহ' = বাহু') ।
২ তাড়—তাড়ঙ্ক, অনন্ত বা তাগা ;
৩ বায়—বাজে ।

ধাইয়া যাইয়া কেহ ধেনু বাহুড়ায়।
জ্ঞানদাস এক ভিতে দাঁড়াইয়া চায় ॥

—জ্ঞানদাস

প্রত্যাবর্তন

চাঁদ-মুখে বেণু দিয়া   সব ধেনু নাম লইয়া
ডাকিতে লাগিলা উচ্চ স্বরে।
শুনিয়া কানাইর বেণু   ঊর্ধ্বমুখে ধায় ধেনু
পুচ্ছ ফেলি' পিঠের উপরে ॥
অবসান বেণুরব   বুঝিয়া রাখাল সব
আসিয়া মিলিল নিজ-সুখে।
যে বনে যে ধেনু ছিল   ফিরিয়া একত্র কৈল
চালাইলা গোকুলের মুখে ॥
শ্বেত-কান্তি অনুপাম   আগে ধায় বলরাম
আর শিশু চলে ডাহিন বাম।
শ্রীদাম সুদাম পাছে   ভাল শোভা করিয়াছে
তার মাঝে নবঘন-শ্যাম ॥
ঘন বাজে শিঙ্গা-বেণু   গগনে গো-খুর রেণু
পথে চলে করি কত ভঙ্গে।
যতেক রাখালগণ   আবা-আবা ঘনে ঘন
বলরাম দাস চলু সঙ্গে ॥

—বলরাম দাস

প্রার্থনা

প্রথমে প্রণাম করি এক করতার—
যেই প্রভু জীবদানে স্থাপিল সংসার ;
আপনা প্রচার হেতু সৃজিল জীবন ;
নিজ ভয় দর্শাইতে সৃজিল মরণ ;
মিষ্টরস সৃজিলেক কৃপা-অনুরোধে ;
তিক্ত-কটু-কষা সৃজি' জানাইল ক্রোধে।
পুষ্পে জন্মাইল মধু সুগুপ্ত আকার ;
সৃজিয়া মক্ষিকা কৈল তাহার প্রচার।
সেই এক ধনপতি, যাহার সংসার
সকলেরে দেয় দান, না টুটে ভাণ্ডার।
ক্ষুদ্র পিপীলিকা হ'তে ঐরাবত আর—
কা'কে নাহি বিস্মরণ, দিয়াছে আহার।
হেন দাতা আছে কোথা শুন জগজন,
সবাকে খাওয়ায় পুনঃ না খায় আপন।
যেই ইচ্ছা সেই করে, কেহ নাহি জানে ;
মন বুদ্ধি অন্ধ ধন্ধ তাহার কারণে।

—আলাওল

ধনপতির বিলাপ

কাণ্ডার ভাই, রাখ ডিঙ্গা যথা পাও স্থল।
নাই জানি দিবারাতি ঝড়ে ডিঙ্গা হয় কাতি
ঝলকে ঝলকে লয় জল ॥
ডিঙ্গা ফিরে যেন চাক কাণ্ডার জীবন রাখ
নাই জানি কোন গ্রহফল।
না জানি দৈবের লীলা ঝড় বৃষ্টি অতি শিলা
সম্মুখে নির্গত বহে জল ॥

শিল যেন পড়ে গুলি ভাঙ্গয়ে মাথার খুলি
বেগে জল বাজে যেন কাঁড়
দুঃসহ বিষম ঝড়ে উপাড়িয়া বৃক্ষ পাড়ে
কাণ্ডার ধরিতে নারে ডাঁড় ॥
দেখহ নায়ের পাশে হাঙ্গর কুমীর ভাসে
দুকূল হানিয়া বহে খানা।
আট দিগে বহে বায়ু পর্বত সমান ঢেউ
রাশি রাশি কত বহে ফেনা ॥

উঠু উঠু করে ডিঙ্গা শরণ করহ গঙ্গা
অন্তকালে ভজ ত্রিলোচন।
পড়িয়া বিষম ফান্দে শঙ্কর বলিয়া কান্দে
ধনপতি বাণ্যার নন্দন ॥

মহামিশ্র জগন্নাথ হৃদয় মিশ্রের তাত
কবিচন্দ্র হৃদয়-নন্দন।
তাহার অনুজ ভাই চণ্ডীর আদেশ পাই
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

—মুকুন্দরাম চক্রবর্তী

অর্জুনের লক্ষ্যভেদ

দ্বিজগণ মধ্যে আছে বসি যুধিষ্ঠির।
চতুর্দিকে বেষ্টি' আছে চারি মহাবীর ॥
আর যত বসিয়াছে ব্রাহ্মণ-মণ্ডল।
দেবগণ মধ্যে যেন শোভে আখণ্ডল ॥
উচ্চস্বরে ধৃষ্টদ্যুম্ন পুনঃ পুনঃ ডাকে।
লক্ষ্য আসি' বিদ্ধ কর যার শক্তি থাকে ॥
যে লক্ষ্য বিন্ধিবে কন্যা লবে সেই বীর।
শুনি ধনঞ্জয় চিত্তে হইল অস্থির ॥
চিত্ত বুঝি যুধিষ্ঠির চাহেন ইঙ্গিতে।
আজ্ঞা পেয়ে ধনঞ্জয় উঠেন ত্বরিতে ॥
অর্জুন চলিয়া যান ধনুকের ভিতে।
দেখিয়া লাগিল দ্বিজগণ জিজ্ঞাসিতে ॥
"কোথাকারে যাহ দ্বিজ কিসের কারণ।
সভা হতে উঠি যাহ কোন্ প্রয়োজন ॥"

অর্জুন বলেন, “যাই লক্ষ্য বিন্ধিবারে।
প্রসন্ন হইয়া সবে আজ্ঞা দেহ মোরে ॥”
শুনিয়া হাসিল যত ব্রাহ্মণ-মণ্ডল।
কন্যাকে দেখিয়া দ্বিজ হইল পাগল ॥
যে ধনুকে পরাজয় পায় রাজগণ।
জরাসন্ধ, শল্য, শাল্ব, কর্ণ, দুর্যোধন ॥
সে লক্ষ্য বিন্ধিতে দ্বিজ চাহে কোন্ লাজে।
ব্রাহ্মণেতে হাসাইল ক্ষত্রিয়-সমাজে ॥
এত বলি ধরাধরি করি বসাইল।
তাহা দেখি যুধিষ্ঠির সবে নিবারিল ॥
“যে লক্ষ্য বিন্ধিতে ভঙ্গ দিল রাজগণ।
শক্তি না থাকিলে তথা যাবে কোন্ জন ?”
যুধিষ্ঠির-বাক্য শুনি ছাড়ি দিল সবে।
ধনুর নিকটে যান ধনঞ্জয় তবে ॥
হাসিয়া ক্ষত্রিয় যত করে উপহাস।
“অসম্ভব কর্মে দেখি দ্বিজের প্রয়াস ॥
সুরাসুর-জয় যেই বিপুল ধনুক।
তাহে লক্ষ্য বিন্ধিবারে চলিল ভিক্ষুক ॥”
কেহ বলে, “ব্রাহ্মণেরে না কহ এমন।
সামান্য মনুষ্য বুঝি না হবে এ জন ॥
দেখ দ্বিজ মনসিজ জিনিয়া মূরতি।
পদ্ম-পত্র যুগ্ম-নেত্র পরশয়ে শ্রুতি ॥
অনুপম তনু শ্যাম নীলোৎপল আভা।
মুখ-রুচি কত শুচি করিয়াছে শোভা ॥

সিংহ-গ্রীব, বন্ধু-জীব অধরের তুল।
খগরাজ পায় লাজ নাসিকা অতুল॥
দেখ চারু যুগ্ম-ভুরু ললাট প্রসর।
কি আনন্দ গতি মন্দ মত্ত করিবর॥
ভুজযুগে নিন্দে নাগে আজানুলম্বিত।
করি-কর যুগ-বর জানু-সুবলিত॥
মহাবীর্য যেন সূর্য জলদে আবৃত।
অগ্নি-অংশু যেন পাংশুজালে আচ্ছাদিত॥
বিন্ধিবেক লক্ষ্য এই লয় মোর মনে।”
ইথে কি সংশয় আর কাশীদাস ভণে॥

—কাশীরাম দাস

অন্নদার আত্মপরিচয়

অন্নপূর্ণা উত্তরিলা গাঙ্গনীর তীরে।
“পার কর” বলিয়া ডাকিলা পাটনীরে॥
সেই ঘাটে খেয়া দেয় ঈশ্বরী পাটনী।
ত্বরায় আনিল নৌকা বামাস্বর শুনি’॥
ঈশ্বরীরে জিজ্ঞাসিল ঈশ্বরী পাটনী।
“একা দেখি কুলবধূ, কে বট আপনি?
পরিচয় না দিলে করিতে নারি পার।
ভয় করি, কি জানি কে দিবে ফেরফার॥”
ঈশ্বরীরে পরিচয় কহেন ঈশ্বরী।
“বুঝহ ঈশ্বরী, আমি পরিচয় করি॥

বিশেষণে সবিশেষ কহিবারে পারি।
জানহ স্বামীর নাম নাহি ধরে নারী॥
গোত্রের প্রধান পিতা মুখ্যবংশজাত।
পরম কুলীন স্বামী বন্দ্যবংশখ্যাত॥
পিতামহ দিলা মোরে অন্নপূর্ণা নাম।
অনেকের পতি তেঁই পতি মোর বাম॥
অতি বড় বৃদ্ধ পতি সিদ্ধিতে নিপুণ।
কোন গুণ নাই তার কপালে আগুন॥
কুকথায় পঞ্চমুখ কণ্ঠভরা বিষ।
কেবল আমার সঙ্গে দ্বন্দ্ব অহর্নিশ॥
গঙ্গা নামে সতা তার তরঙ্গ এমনি।
জীবনস্বরূপা সে স্বামীর শিরোমণি॥
ভূত নাচাইয়া পতি ফেরে ঘরে ঘরে।
না মরে পাষাণ বাপ দিলা হেন বরে॥
অভিমানে সমুদ্রেতে ঝাঁপ দিলা ভাই।
যে মোরে আপন ভাবে তারি ঘরে যাই॥"

পাটনী বলিছে, "মা গো, বুঝিনু সকল।
যেখানে কুলীন জাতি সেখানে কোন্দল॥
শীঘ্র আসি নায়ে চড়, দিবা কিবা বল।"
দেবী কন, "দিব, আগে পারে লয়ে চল॥"
যার নামে পার করে ভব-পারাবার।
ভাল ভাগ্য, পাটনী তাহারে করে পার॥

—ভারতচন্দ্র রায়

ঝড়

ঝন ঝন সন সন সমীরণ হাঁকিছে।
গুড় গুড় হুড় হুড় ঘনকুল ডাকিছে॥
চপলার স্বর্ণহার আকাশেতে উড়িছে।
দ্বিজ সব কলরব ফুলবনে যুড়িছে॥
হতবল তরুদল ধরাতল লুঠিছে।
দলচয় স্থির নয় বায়ুবেগে ছুটিছে॥
ছেড়ে পথ শূন্য রথ ধূলিচয় চড়িছে।
দুম দাম অবিশ্রাম দ্বারে দ্বার পড়িছে॥
এ কি ধূলি যেন হুলি পুনরায় জাঁকিছে।
ঝন ঝন করে রণ যেন তোপ দাগিছে॥
পড়ে জল অবিরল মুক্তাফল ঝরিছে।
তড় তড় তড় বড় কি যে রব করিছে॥
সুখাকুল ভেককুল ঘোর নাদ ছাড়িছে।
ক্রমে ক্রমে পরাক্রম বরষার বাড়িছে॥
একেবারে এক ধারে বজ্রবাড় ঝাড়িছে।
নীরদের মস্তকের চূড়া ভাঙ্গি পড়িছে॥
হল বৃষ্টি গেল রিষ্টি যেন সৃষ্টি হাসিছে।
ত্রিলোকের পালকের মহিমা প্রকাশিছে॥
কবিদের হৃদয়ের দ্বার খুলে যেতেছে।
স্বভাবের দেখি ফের রচনায় মেতেছে॥

—ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

সীতা ও সরমা

“ছিনু মোরা, সুলোচনে, গোদাবরী-তীরে—
কপোত-কপোতী যথা উচ্চ বৃক্ষ-চূড়ে
বাঁধি নীড়, থাকে সুখে ; ছিনু ঘোর বনে,
নাম পঞ্চবটী, মর্ত্তে সুর-বন সম।
সদা করিতেন সেবা লক্ষ্মণ সুমতি।
দণ্ডক ভাণ্ডার যার, ভাবি দেখ মনে,
কিসের অভাব তার ? যোগাতেন আনি
নিত্য ফল-মূল বীর সৌমিত্রি, মৃগয়া
করিতেন কভু প্রভু, কিন্তু জীব-নাশে
সতত বিরত, সখি, রাঘবেন্দ্র বলী,—
দয়ার সাগর নাথ বিদিত জগতে !
ভুলিনু পূর্ব্বের সুখ। রাজার নন্দিনী,
রঘু-কুল-বধূ আমি, কিন্তু এ কাননে,
পাইনু, সরমা সই, পরম পিরীতি !
কুটিরের চারিদিকে কত যে ফুটিত
ফুলকুল নিত্য নিত্য, কহিব কেমনে ?
পঞ্চবটী-বনচর মধু নিরবধি !
জাগাত প্রভাতে মোরে কুহরি' সুস্বরে
পিকরাজ ! কোন্ রাণী, কহ শশিমুখি,
হেন চিত্ত-বিনোদন বৈতালিক-গীতে

খোলে আঁখি ? শিখি সহ, শিখিনী সুখিনী
নাচিত দুয়ারে মোর। নর্তক নর্তকী
এ দোঁহার সম, বামা, আছে কি জগতে ?
অতিথি আসিত নিত্য করভ-করভী,
মৃগ-শিশু, বিহঙ্গম, স্বর্ণ-অঙ্গ কেহ…
অহিংস্রক জীব যত। সেবিতাম সবে,
মহাদরে ; পালিতাম পরম যতনে,
মরুভূমে স্রোতস্বতী তৃষাতুরে যথা,
আপনি সুজলবতী বারিদ-প্রসাদে।
সরসী আরসী মোর। তুলি কুবলয়ে,
(অমূল্য রতন সম) পরিতাম কেশে ;
সাজিতাম ফুল-সাজে ; হাসিতেন প্রভু,
বনদেবী বলি মোরে সম্ভাষি কৌতুকে।
হায়, সখি, আর কি লো পাব প্রাণনাথে ?
আর কি পোড়া আঁখি এ ছার জনমে
দেখিবে সে পা দু'খানি—আশার সরসে
রাজীব, নয়নমণি ? হে দারুণ বিধি,
কি পাপে পাপী এ দাসী তোমার সমীপে ?"
এতেক কহিয়া দেবী কাঁদিলা নীরবে।
কাঁদিলা সরমা সতী তিতি অশ্রু-নীরে।

—মাইকেল মধুসূদন দত্ত

হিমালয়

অসীম নীরদ নয় ;
ও-ই গিরি হিমালয়।
উথলে উঠেছে যেন অনন্ত জলধি।
ব্যেপে দিগ্‌-দিগন্তর,
তরঙ্গিয়া ঘোরতর,
প্লাবিয়া গগনাঙ্গন জাগে নিরবধি।
বিশ্ব যেন ফেলে পাছে
কি এক দাঁড়ায়ে আছে,
কি এক প্রকাণ্ড কাণ্ড মহান ব্যাপার
কি এক মহান মূর্তি,
কি এক মহান স্ফূর্তি
মহান উদার সৃষ্টি প্রকৃতি তোমার।
পদে পৃথ্বী, শিরে ব্যোম,
তুচ্ছ তারা সূর্য সোম,
নক্ষত্র, নখাগ্রে যেন গণিবারে পারে।
সমুখে সাগরাম্বরা
ছড়িয়ে রয়েছে ধরা,
কটাক্ষে কখন যেন দেখিছে তাহারে।
ঝটিকা দুরন্ত মেয়ে
বুকে খেলা করে ধেয়ে
ধরিত্রী গ্রাসিয়া সিন্ধু লোটে পদতলে।

জ্বলন্ত অনল-ছবি
ধ্বক ধ্বক জ্বলে রবি
কিরণ-জ্বলন জ্বালা মালা শোভে গলে।
কালের করাল হাসি
দমকে দামিনীরাশি,
কড়কড় দন্তে দন্তে ভীষণ ঘর্ষণ ;
ত্রিজগৎ ত্রাহি ত্রাহি ;
কিছুই ভ্রূক্ষেপ নাহি ;
কে যোগেন্দ্র ব্যোমকেশ যোগে নিমগন !

(সংক্ষেপিত)
—বিহারীলাল চক্রবর্তী

মাতৃস্তুতি

না জন্মিতে করিয়াছ মঙ্গল-কামনা !
হেন প্রেম ধরে কোন্ জনা ?
পেতে সুত সুলক্ষণ, কত ব্রত আচরণ,
কত বা মনন দেবতায় !
প্রসীদ, প্রসন্ন-মনা জননি আমায় !

কে জানে, কিরূপে মাতা করেছে পালন
নিজ সুখে দিয়া বিসর্জন।

কখন বা অর্দ্ধাশনে কখন বা অনশনে
কত নিশি জাগিয়াছে হায় !
প্রসীদ, প্রসন্ন-মনা জননি আমায় !

বিরলে বসিয়া করি যখন চিন্তন,
সিন্ধু-জলে তরঙ্গ যেমন,—
হৃদে তব স্নেহ-কথা একে একে উঠে তথা,
যত স্মরি তবু না ফুরায় !
প্রসীদ, প্রসন্ন-মনা জননি আমায় !

স্থানান্তরে যদি কভু করেছি গমন,
না এলে না করেছ ভোজন,—
কভু পথে, কভু ঘরে, ছুটিতে উদ্বেগ-ভরে
মণিহারা ফণিনীর প্রায়।
প্রসীদ, প্রসন্ন-মনা জননি আমায় !

মম অপরাধ যদি কর মা গ্রহণ,
আমি তবে বাঁচি কতক্ষণ ?
মম বুদ্ধি বল যাহা সব তুমি জান তাহা,
অবোধের দোষ পায় পায়।
প্রসীদ, প্রসন্ন-মনা জননি আমায় !

(সংক্ষেপিত)

—সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার

পরশমণি

কে বলে পরশমণি অলীক স্বপন ?
অই যে অবনীতলে পরশমাণিক জ্বলে,
বিধাতা-নির্মিত চারু মানব নয়ন।
পরশমণির সনে লৌহ-অঙ্গ পরশনে,
সে লৌহ কাঞ্চন হয় প্রবাদ বচন,—
এ মণি পরশে যায় মাণিক ঝলসে তায়,
বরিষে কিরণধারা নিখিল ভুবন।

পরশমাণিক যদি অলীক হইত,
কোথা বা এ শশধর, কোথা বা ভানুর কর,
কোথা বা নক্ষত্র-শোভা গগনে ফুটিত ;
কে রাখিত চিত্র ক'রে চাঁদের জোছনা ধ'রে
তরঙ্গ মেঘের অঙ্গে এমন মাখায়ে ?
কে বা এই সুশীতল বিমল গঙ্গার জল
ভারত ভূষণ করি' রাখিত ছড়ায়ে ?
কে দেখাত তরুকুল, নানা রঙ্গ নানা ফুল,
মরাল হরিণ মৃগে পৃথিবী শোভিয়া ?
ইন্দ্রধনু আলো তুলে সাজায়ে বিহঙ্গকুলে,
কে রাখিত শিখিপুচ্ছে শশাঙ্ক আঁকিয়া ?

নদীজলে মীন খেলে, বিটপীতে পাতা হেলে—
চরে বালুকণা ফুটে, দূর্বায় হিমানী ;
পক্ষী পাখে উড়ে যায়, কীটেরা শ্রেণীতে ধায়,
কঙ্করে তুষার পড়ে, ঝিনুকে চিক্কণী।
তাতেও আনন্দ হয়— অরণ্য কুজ্ঝটিময়,
জ্বলন্ত বিদ্যুৎ-লতা, তমিস্রা রজনী।

অপূর্ব মাণিক এই পরশ-কাঞ্চন।
জননী-বদন-ইন্দু জগতে করুণা-সিন্ধু,
দয়াল পিতার মুখ, জায়ার বদন,
শত শশি-রশ্মিমাখা চারু-ইন্দীবর-আঁকা
পুত্রের অধর-ওষ্ঠ, নলিন-আনন ;
সোদরের সুকোমল, স্বসা-মুখ নিরমল,
পবিত্র প্রণয়পাত্র ; গৃহীর কাঞ্চন—
এই মণি পরশনে হয় সুখ দরশনে,
মানব জনম সার—সফল জীবন।
কে বলে পরশমণি অলীক স্বপন ?

(সংক্ষেপিত)

—হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

কুরুক্ষেত্র

রণক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে শোকের সাগর !
শবচক্র মহাবেলা ; প্রশান্ত প্রাঙ্গন
ব্যাপিয়া পাণ্ডবসৈন্য, উর্মির মতন
উদ্বেলিত মহাশোকে, কাঁদে অধোমুখে—
গুণহীন ধনু, পৃষ্ঠে শরহীন তূণ।
রথী মহারথিগণ বসিয়া ভূতলে
কাঁদিছেন অধোমুখে যেন আভাহীন
সিক্ত রত্নরাজি পড়ি' রত্নাকর-তলে।
কেন্দ্রস্থলে অভিমন্যু, শবের শয্যায়
সিদ্ধকাম মহাশিশু! ক্ষত কলেবর
রক্তজবা সমাবৃত ; সস্মিত বদন
মায়ের পবিত্র অঙ্কে করিয়া স্থাপিত
—সন্ধ্যাকাশে যেন স্থির নক্ষত্র উজ্জ্বল—
নিদ্রা যাইতেছে সুখে। কেবল অচল
সেই মহাশোকক্ষেত্রে একটি হৃদয়—
সেই নেত্র, সেই বুক, মাতা সুভদ্রার।
চাপি' মৃত পুত্রমুখ মায়ের হৃদয়ে
দুই করে, বিস্ফারিত নেত্রে প্রীতিময়,
যোগস্থা জননী চাহি আকাশের পানে,—
আদর্শ-বীরত্ব বক্ষে প্রীতির প্রতিমা!

নীরব বিস্তৃত ক্ষেত্র। মূর্ছিত অর্জুন!
পড়িতে, ধরিলা কৃষ্ণ বাহু প্রসারিয়া।
উচ্ছ্বাসে কহিলা কৃষ্ণ—"অর্জুন! অর্জুন!
আমরা বীরের জাতি, বীরধর্ম রণ।
অযোগ্য এ শোক তব। এই বীরক্ষেত্র
করিও না কলঙ্কিত করিয়া বর্ষণ
একবিন্দু শোক-অশ্রু। বীরর্ষভ তুমি,
বীরশোক অশ্রু নহে, কর্মে দৃঢ়পণ।"

—নবীনচন্দ্র সেন

শ্রাবণ

ঝুম ঝুম গুম গুম গুরু গরজন,
চল চল ছল ছল উছলে শ্রাবণ।
নাহি পথ, নাহি ঘাট, ডুবিয়া গিয়াছে মাঠ,
অবিরল নভোময় ঘন বরষণ!
নদ নদী খালে বিলে সকলে গিয়াছে মিলে,
দুকূল ভাসায়ে হবে আকুল প্লাবন।
অথই অগাধ জল নাহি কূল, নাহি তল,
শশী রবি যত সবি তাহে নিমগন,
অতলে ডুবেছে আজ ভূতলে গগন।
চল চল, ছল ছল উছলে শ্রাবণ॥

প্লাবনে ভাসিছে ধান, পদ্মপাতা খান খান,
ঘূর্ণিত চূর্ণিত জলে গ্রহ তারাগণ।
শ্যামল গ্রামের গায় শ্যাম জল বহে যায়
ডুবাইয়া ডুবাইয়া শ্যাম বীথি-বন,
কয়ে যায় কত কথা লয়ে যায় কত ব্যথা
ঘোমটার ঘামে ভেজা কত আলাপন।
কদম্ব কুসুম সহ ঝরে তাহে অহরহ
কত আশা ভালবাসাবাসি পুরাতন।
চল চল, ছল ছল উছলে শ্রাবণ॥

—গোবিন্দচন্দ্র দাস

ধূলা

কোন্ ঐন্দ্রজালিকের অস্থি-অবশেষ
কহ তুমি, লো কণিকে, মোর কানে কানে!
উড়ে উড়ে কর সদা কাহার উদ্দেশ?
প্রকাশ্য নিবাস-পথে যায় পায়-পায়,
ঘৃণা-ভরে ফেলে ঝেড়ে কে বা না তোমায়?
নিরভিমানিনি অয়ি! তবু কর স্থিতি
লুকায়ে গৃহের কোণে; অযত্ন-পালিতা—
দরিদ্রা বালিকা মতো ধনীর ভবনে;

দীনেরো কুটিরে তুমি নহ সম্মানিতা
লো মলিনে ! অই তব মলিন বসনে
ঢাকা যে সৌন্দর্যরাশি, বিশ্বানুলেপন,
—মোরা বিজ্ঞ, মোরা অজ্ঞ—চিনেও চিনি না।
জগৎ-জননী রূপ ! তোমারে যে চিনে
স্বভাব-সুন্দর শিশু, মহানন্দ মনে
মাখে কায় নিয়ে তুলি' অঞ্জলি অঞ্জলি
নগ্ন অঙ্গে কিবা শোভা ধর তুমি ধূলি !
বাল্য-সখি, চিনি তব মধুর মূরতি,
করিয়াছি একদিন সাদরে আরতি !
আদ্যন্ত-স্বরূপা তব মহিমা অশেষ,
অবসান তোরি মাঝে সর্ব-গর্ব লেশ !

—গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী

চাহিবেনা ফিরে

পথে দেখে, ঘৃণাভরে কত কেহ গেল স'রে ;
উপহাস করি' কেহ যায় পায়ে ঠেলে ;
কেহ বা নিকটে আসি' বরষি' গঞ্জনারাশি,
ব্যথিতেরে ব্যথা দিয়া যায় শেষে ফেলে।
পতিত মানব-তরে নাহি কি গো এ সংসারে
একটি ব্যথিত প্রাণ, দু'টি অশ্রুধার ?

পথে প'ড়ে অসহায়,   পদে তারে দ'লে যায়,—
দু'খানি স্নেহের কর নাহি বাড়াবার ?
সত্য, দোষে আপনার   চরণ স্খলিত তার,
তাই তোমাদের পদ উঠিবে ও-শিরে ?
তাই তার আর্তরবে   সকলে বধির হবে,
যে যাহার চলে যাবে—চাহিবে না ফিরে ?
বর্তিকা লইয়া হাতে,   চলেছিল একসাথে
পথে নিবে গেছে আলো, পড়িয়াছে তাই ;
তোমরা কি দয়া ক'রে   তুলিবে না হাতে ধ'রে ?—
অর্ধ দণ্ড তার লাগি' থামিবে না ভাই ?
তোমাদের বাতি দিয়া   প্রদীপ জ্বালিয়া নিয়া
তোমাদেরি হাত ধরি' হোক অগ্রসর ;
পঙ্ক মাঝে অন্ধকারে   ফেলে যদি যাও তারে,
আঁধার রজনী তার রবে নিরন্তর।

—কামিনী রায়

মা

তবু ভরিল না চিত্ত ; ঘুরিয়া ঘুরিয়া
কত তীর্থ হেরিলাম। বন্দিনু পুলকে
বৈদ্যনাথে ; মুঙ্গেরের সীতাকুণ্ডে গিয়া
কাঁদিলাম চিরদুঃখী জানকীর দুঃখে ;
হেরিনু বিন্ধ্যবাসিনী বিন্ধ্যে আরোহিয়া ;
করিলাম পুণ্য-স্নান ত্রিবেণী সঙ্গমে ;

"জয় বিশ্বেশ্বর" বলি' ভৈরবে বেড়িয়া,
করিলাম কত নৃত্য ; প্রফুল্ল আশ্রমে
রাধাশ্যামে নিরখিয়া হইয়া উতলা,
গীতগোবিন্দের শ্লোক গাহিয়া গাহিয়া
ভ্রমিলাম কুঞ্জে কুঞ্জে ; পাণ্ডারা আসিয়া
গলে পরাইয়া দিল বর গুঞ্জ-মালা।
তবু ভরিল না চিত্ত ; সর্ব-তীর্থ-সার,
তাই মা তোমার পাশে এসেছি আবার।

—দেবেন্দ্রনাথ সেন

সন্ধ্যারাণী

আসে সন্ধ্যারাণী
সুনীল বসনে ঢাকি' ফুলতনুখানি।
ধূমল গুণ্ঠন আড়ে   মুখশশী উঁকি মারে,
শরমে উছলি পড়ে মমতার বাণী।
নব-নীলোৎপল-সম   আঁখি দুটি মনোরম,
সংকোচে কুণ্ঠায় যেন বাঁধিছে চরণ।
পতির পবিত্র ঘরে   সতী পরবেশ করে
হাতে সুবর্ণের দীপ, হৃদয়ে কম্পন।
আসে ধনী আতিবিথি   কপালে তারকা সীথি
সীমন্তে সিন্দূর-বিন্দু—দিনান্ত-তপন।

গুচ্ছ-গুচ্ছ কালো চুলে   ম্লান অন্ধকার দুলে
দিগন্ত-বসনাঞ্চলে কত না রতন !
ঘরে ঘরে দীপ জ্বলে   দেউলে তুলসীতলে
যেন শত চক্ষু মেলে হেরিছে ধরণী।
মন্দিরে মঙ্গলারতি   হেরে মৌনে সন্ধ্যাসতী,
পুরনারী ভক্তিভরে করে শঙ্খধ্বনি।

—অক্ষয়কুমার বড়াল

মুক্ত করো ভয়

সংকোচের বিহ্বলতা নিজেরে অপমান
সংকটের কল্পনাতে হয়ো না ম্রিয়মাণ।
মুক্ত করো ভয়,
আপনা মাঝে শক্তি ধরো, নিজেরে করো জয়॥

দুর্বলেরে রক্ষা করো, দুর্জনেরে হানো,
নিজেরে দীন নিঃসহায় যেন কভু না জানো।
মুক্ত করো ভয়,
নিজের 'পরে করিতে ভর না রেখো সংশয়॥

ধর্ম যবে শঙ্খ-রবে করিবে আহ্বান,
নীরব হয়ে নম্র হয়ে পণ করিয়ো প্রাণ।
মুক্ত করো ভয়,
দুরূহ কাজে নিজেরই দিয়ো কঠিন পরিচয়॥

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পিলসুজের উপর পিতলের প্রদীপ

পিলসুজের উপর পিতলের প্রদীপ,
খড়কে দিয়ে উসকে দিচ্ছে থেকে থেকে।
হাতীর দাঁতের মতো কোমল সাদা
পঙ্খের-কাজ-করা মেজে,
তার উপরে খান দুয়েক মাদুর পাতা।
ছোট ছেলেরা জড় হয়েছি ঘরের কোণে
মিটমিটে আলোয়।
বুড়ো মোহন সর্দার—
কলপ-লাগানো চুল বাবরি-করা,
মিশকালো রঙ,
চোখদুটো যেন বেরিয়ে আসছে,
শিথিল হয়েছে মাংস,
হাতের পায়ের হাড়গুলো দীর্ঘ,
কণ্ঠস্বর সরু-মোটায় ভাঙা।
রোমাঞ্চ লাগাবার মতো তার পূর্ব ইতিহাস।
বসেছে আমাদের মাঝখানে,
বলছে রোঘো ডাকাতের কথা।
আমরা সবাই গল্প আঁকড়ে বসে আছি।
দক্ষিণের হাওয়া-লাগা ঝাউডালের মতো
দুলছে মনের ভিতরটা।

খোলা জানলার সামনে দেখা যায় গলি,
একটা হলদে গ্যাসের আলোর খুঁটি
দাঁড়িয়ে আছে একচোখো ভূতের মতো।
পথের বাঁ-ধারটাতে জমেছে ছায়া।
গলির মোড়ে সদর রাস্তায়
বেলফুলের মালা হেঁকে গেল মালী।
পাশের বাড়ি থেকে
কুকুর ডেকে উঠল অকারণে।
ন'টার ঘণ্টা বাজল দেউড়িতে।
অবাক হয়ে শুনছি রোঘোর চরিতকথা।

তত্ত্বরত্নের ছেলের পৈতে,
রোঘো ব'লে পাঠাল চরের মুখে—
"নমো নমো করে সারলে চলবে না ঠাকুর,
ভেবো না খরচের কথা।"
মোড়লের কাছে পত্র দেয়
পাঁচ হাজার টাকা দাবি ক'রে ব্রাহ্মণের জন্যে।
রাজার খাজনা-বাকির দায়ে
বিধবার বাড়ি যায় বিকিয়ে,
হঠাৎ দেওয়ানজির ঘরে হানা দিয়ে
দেনা শোধ করে দেয় রঘু।
বলে, "অনেক গরিবকে দিয়েছ ফাঁকি,
কিছু হালকা হোক তার বোঝা।"

একদিন তখন মাঝরাত্তির—
ফিরছে রোঘো লুটের মাল নিয়ে,
নদীতে তার ছিপের নৌকো
অন্ধকারের বটের ছায়ায়।
পথের মধ্যে শোনে,
পাড়ায় বিয়েবাড়িতে কান্নার ধ্বনি,
বর ফিরে চলেছে বচসা করে ;
কনের বাপ পা আঁকড়ে ধরেছে বরকর্তার।
এমন সময় পথের ধারে
ঘন বাঁশবনের ভিতর থেকে
হাঁক উঠল, রে রে রে রে রে রে।
আকাশের তারাগুলো
যেন উঠল থর্থরিয়ে।
সবাই জানে রোঘো ডাকাতের
পাঁজর-ফাটানো ডাক।
বরসুদ্ধ পালকি পড়ল পথের মধ্যে ;
বেহারা পালাবে কোথায় পায় না ভেবে।
ছুটে বেরিয়ে এল মেয়ের মা ;
অন্ধকারের মধ্যে উঠল তার কান্না,—
"দোহাই বাবা, আমার মেয়ের জাত বাঁচাও।"
রোঘো দাঁড়াল যমদূতের মতো—
পালকি থেকে টেনে বের করলে বরকে,
বরকর্তার গালে মারল একটা প্রচণ্ড চড়,
পড়ল সে মাথা ঘুরে।

ঘরের প্রাঙ্গণে আবার শাঁক উঠল বেজে,
জাগল হুলুধ্বনি,
দলবল নিয়ে রোঘো দাঁড়াল সভায়
শিবের বিয়ের রাতে ভূতপ্রেতের দল যেন।
উলঙ্গপ্রায় দেহ সবার, তেলমাখা সর্বাঙ্গ,
মুখে ভুসোর কালি।
বিয়ে হল সারা।
তিন পহর রাতে
যাবার সময় কনেকে বললে ডাকাত,
"তুমি আমার মা,
দুঃখ যদি পাও কখনো
স্মরণ কোরো রঘুকে।"

তারপর এসেছে যুগান্তর।
বিদ্যুতের প্রখর আলোতে
ছেলেরা আজ খবরের কাগজে
পড়ে ডাকাতির খবর।
রূপকথা-শোনা নিভৃত সন্ধেবেলাগুলো
সংসার থেকে গেল চ'লে
আমাদের স্মৃতি
আর নিবে-যাওয়া তেলের প্রদীপের সঙ্গে সঙ্গে।

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রার্থনা

পূর্ণ জ্যোতিঃ তুমি, ঘোষে দিনপতি,
অশনি প্রকাশে অসীম শকতি,
বিহঙ্গম গাহে তব যশোগীতি,
চন্দ্রমা কহিছে, তুমি সুশীতল।
উদ্বেলিত সিন্ধু-তরঙ্গ উত্তাল
প্রকাশে তোমারি মূরতি করাল ;
মরীচিকা ঘোষে তব ইন্দ্রজাল,
শিশির কহিছে, তুমি নিরমল।
পুষ্প কহে, তুমি চির শোভাময়,
মেঘবারি কহে, মঙ্গল আলয়,
গগন কহিছে, অনন্ত অক্ষয়,
ধ্রুবতারা কহে, তুমি অচঞ্চল।
নদী কহে, তুমি তৃষ্ণা-নিবারণ,
বায়ু কহে, তুমি জীবের জীবন,
নিশীথিনী কহে, শান্তি-নিকেতন,
প্রভাত কহিছে, সুন্দর উজল।

—রজনীকান্ত সেন

নন্দলাল

নন্দলাল তো একদা একটা করিল ভীষণ পণ—
স্বদেশের তরে, যা করেই হোক, রাখিবেই সে জীবন।
সকলে বলিল, 'আ-হা-হা কর কি, কর কি, নন্দলাল।'
নন্দ বলিল, 'বসিয়া বসিয়া রহিব কি চিরকাল—
আমি না করিলে, কে করিবে আর উদ্ধার এই দেশ?'
তখন সকলে বলিল,—'বাহবা বাহবা বাহবা বেশ!'

নন্দর ভাই কলেরায় মরে, দেখিবে তাহারে কেবা?
সকলে বলিল, 'যাও না নন্দ, কর না ভায়ের সেবা।'
নন্দ বলিল, 'ভায়ের জন্য জীবনটা যদি দিই—
না হয় দিলাম—কিন্তু অভাগা দেশের হইবে কি?
বাঁচাটা আমার অতি দরকার, ভেবে দেখি চারিদিক।'
তখন সকলে বলিল,—'হাঁ হাঁ হাঁ, তা বটে, তা বটে, ঠিক!'

নন্দ বাড়ির হত না বাহির, কোথা কি ঘটে কি জানি
চড়িত না গাড়ি, কি জানি কখন উলটায় গাড়িখানি,
নৌকা ফি সন ডুবিছে ভীষণ, রেলে 'কলিশন' হয়;
হাঁটিতে সর্প, কুক্কুর আর গাড়ি-চাপা-পড়া ভয়;
তাই শুয়ে শুয়ে, কষ্টে বাঁচিয়ে রহিল নন্দলাল।
সকলে বলিল,—'ভ্যালারে নন্দ, বেঁচে থাক চিরকাল।'

—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

কাজলা দিদি

বাঁশ-বাগানের মাথার উপর চাঁদ উঠেছে ওই—
মাগো, আমার শোলক-বলা কাজলা দিদি কই ?
পুকুর-ধারে লেবুর তলে,
থোকায় থোকায় জোনাক জ্বলে,
ফুলের বাসে ঘুম আসে না, একলা জেগে রই—
মাগো, আমার কোলের কাছে কাজলা দিদি কই ?

সেদিন হ'তে কেন মা আর দিদিরে না ডাক ;
দিদির কথায় আঁচল দিয়ে মুখটি কেন ঢাক ?
খাবার খেতে আসি যখন,
'দিদি' ব'লে ডাকি তখন,
ও-ঘর থেকে কেন মা আর দিদি আসে না ক' ?
আমি ডাকি, তুমি কেন চুপটি ক'রে থাক ?

বল্ মা, দিদি কোথায় গেছে, আসবে আবার কবে ?
কাল যে আমার নতুন ঘরে পুতুল-বিয়ে হবে !
দিদির মতন ফাঁকি দিয়ে,
আমিও যদি লুকাই গিয়ে,
তুমি তখন একলা ঘরে কেমন করে রবে ?
আমিও নাই—দিদিও নাই—কেমন মজা হবে !

ভূঁইচাঁপাতে ভরে গেছে শিউলি গাছের তল,
মাড়াস নে মা পুকুর থেকে আনবি যখন জল।
ডালিমগাছের ফাঁকে ফাঁকে
বুলবুলিটা লুকিয়ে থাকে,
উড়িয়ে তুমি দিও না মা, ছিঁড়তে গিয়ে ফল,
দিদি যখন শুনবে এসে বলবি কি মা বল ?

বাঁশ-বাগানের মাথার উপর চাঁদ উঠেছে ওই,
এমন সময়, মাগো, আমার কাজলা দিদি কই ?
লেবুর তলে পুকুর-পাড়ে,
ঝিঁ ঝিঁ ডাকে ঝোপে-ঝাড়ে,
ফুলের বাসে ঘুম আসে না, তাইতে জেগে রই,—
রাত্রি হ'ল, মাগো আমার কাজলা দিদি কই ?

—যতীন্দ্রমোহন বাগচী

দূরের পাল্লা

ছিপ্‌খান্ তিন-দাঁড়—
তিনজন মাল্লা
চৌপর দিন-ভোর
দেয় দূর সমান পাল্লা।

কঞ্চির তীর-ঘর
ঐ চর জাগছে,
বন-হাঁস ডিম তার
শ্যাওলায় ঢাকছে।

চুপ চুপ—ওই ডুব
দেয় পানকৌটি,
দেয় ডুব টুপ টুপ
ঘোমটার বউটি।

রূপশালি ধান বুঝি
এই দেশে সৃষ্টি,
ধূপছায়া যার শাড়ি
তার হাসি মিষ্টি।

পান-সুপারি! পান-সুপারি!
এই খানেতে শঙ্কা ভারি,
পাঁচ পীরেরই শির্নি মেনে
চল রে টেনে বৈঠা হেনে;

বাঁক সমুখে, সামনে ঝুঁকে,
বাঁয় বাঁচিয়ে, ডাইনে রুখে,
বুক দে টানো, বৈঠা হানো—
সাত সতেরো কোপ কোপানো।
হাড়-বেরুনো খেজুরগুলো
ডাইনী যেন ঝামর-চুলো
নাচতেছিল সন্ধ্যাগমে
লোক দেখে কি থমকে গেল?
জমজমাটে জাঁকিয়ে ক্রমে
রাত্রি এলো, রাত্রি এলো।
ঝাপসা আলোয় চরের ভিতে
ফিরছে কারা মাছের পাছে,
পীর বদরের কুদ্‌রতিতে
নৌকো বাঁধো হিজল-গাছে।

* * * *

লক লক শর-বন
বক তায় মগ্ন,
চুপচাপ চারদিক্
সন্ধ্যার লগ্ন।

চারদিক্ নিঃসাড়,
ঘোর-ঘোর রাত্রি,
ছিপ্‌খান্ তিন-দাঁড়
চারজন যাত্রী।

* * *

জড়ায় ঝাঁঝি দাঁড়ের মুখে,
ঝাউয়ের বীথি হাওয়ায় ঝুঁকে
ঝিমায় বুঝি ঝিঁঝির গানে—
স্বপন পানে পরাণ টানে।

তারায় ভরা আকাশ ও কি
ভুলোয় পেয়ে ধূলোর 'পরে
লুটিয়ে প'ল আচম্বিতে
কুহক-মোহ মন্ত্র ভরে!

*　　*　　*

আর জোর দেড় ক্রোশ—
জোর দেড় ঘন্টা,
টান্ ভাই, টান্ সব—
নেই উৎকণ্ঠা।

চাপ্ চাপ্ শ্যাওলার
দ্বীপ সব সার সার,—
বৈঠার ঘায় সেই
দ্বীপ সব নড়ছে,
ভয় পেয়ে হাঁস তায়
জল-গায় চড়ছে।

ওই মেঘ জমছে,
চল ভাই সমঝে,
গাও গান, দাও শিশ—
বকশিশ্! বকশিশ্!

খুব জোর ডুব-জল,
বয় স্রোত ঝিরঝির,
নেই ঢেউ কল্লোল,
নয়—দূর নয় তীর।

নেই নেই শঙ্কা,
চল্ সব ফুর্তি,—
বকশিশ্ টঙ্কা,
বকশিশ্ ফুর্তি।

ঘোর-ঘোর সন্ধ্যায়,
ঝাউগাছ দুলছে,
ঢোল-কলমির ফুল
তন্দ্রায় ঢুলছে।

—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

পল্লী-জননী

একি অপরূপ রূপে মা তোমায় হেরিনু পল্লী-জননি,
ফুলে ও ফসলে কাদা-মাটি-জলে ঝলমল করে লাবণি ॥

রৌদ্র-তপ্ত বৈশাখে তুমি চাতকের সাথে চাহ জল,
আম-কাঁটালের মধুর গন্ধে জ্যৈষ্ঠে মাতাও তরুতল।
ঝঞ্ঝার সাথে প্রান্তরে মাঠে কভু খেল লয়ে অশনি ॥

কেতকী কদম যূথিকা কুসুমে বর্ষায় গাঁথ মালিকা,
পথে অবিরল ছিটাইয়া জল খেল চঞ্চলা বালিকা।
তড়াগে পুকুরে থই থই করে শ্যামল শোভার নবনী ॥

শাপলা-শালুকে সাজাইয়া সাজি শরতে শিশিরে নাহিয়া,
শিউলি-রঙিন শাড়ি প'রে ফের আগমনী-গীতি গাহিয়া।
অঘ্রাণে মাগো আমন ধানের সুঘ্রাণে ভরো অবনী ॥

শীতের শূন্য মাঠে ফের তুমি উদাসী বাউল সাথে মা,
ভাটিয়ালি গাও মাঝিদের সাথে, কীর্তন শোন রাতে মা ;
ফাল্গুনে রাঙা ফুলের আবীরে রাঙাও নিখিল ধরণী ॥

—কাজী নজরুল ইসলাম

মরুভূমি

চূর্ণ ভগ্ন আকাঙ্ক্ষা দিয়ে গঠিত হয়েছ তুমি,
আকাশস্পর্শী চিত্তের চিতাভূমি।
রূপ লভে তব দুঃস্বপ্নও নাকি ?
দেখা দেয় হয়ে উষ্ট্র ও উটপাখি,
অগ্নি-মন্দ্রে মরীচিকা হয়
জলবায়ু মৈশুমি।

পাড়ি দেয় তব মরীচিকা মাঝে নাবিক সিন্ধুবাদ,
আলাদীন দেয় প্রদীপের সংবাদ।
দস্যুদলের রত্নাগারের খোঁজ—
পেতে আলিবাবা ভ্রমিছে সেখানে রোজ ;
রৌদ্রময়ী সে সহস্র এক
নিশি—ঘোরে দিবা সাথ।

পড়ে আছ তুমি অতি প্রকাণ্ড ভূর্জপত্র প্রায়,
কিছু আঁকা নাই, কিছু লেখা নাই তায়।
এখনো জানিতে পারে নি কেহই ভবে
বিশ্বকবির কি পাণ্ডুলিপি হবে ?
ভবিষ্যতের কি মানচিত্র
চিত্রিত হবে তায় ?

তোমাতে মানব-মনের ঝঞ্ঝা হইয়াছে রূপায়িত,
করে চরাচরে উৎকণ্ঠিত ভীত।
সুদূর বিরল খর্জুর-বীথিকায়,
জন্মান্তর স্নেহ তব জাগে হায়,
আতিশয্যের শয্যা যে তুমি
যত তাপ তত শীত।

তোমার আধেক সৃষ্টির দেওয়া, আধা প্রলয়ের দান,
কায়া চেয়ে তব ছায়ার উপরে টান।
সন্দেহ কর তুমি কি সভ্যতাকে?
বালুকায় যেন ঢেকে দিতে চাও তাকে,
চাও আলো, আরও আলো ও মুক্তি—
সুদূরের সন্ধান।

(সংক্ষেপিত)
—কুমুদরঞ্জন মল্লিক

হাট

দূরে দূরে গ্রাম দশ-বারোখানি, মাঝে একখানি হাট,
সন্ধ্যায় সেথা জ্বলে না প্রদীপ, প্রভাতে পড়ে না ঝাঁট।
বেচা-কেনা সেরে বিকালবেলায়
যে যাহার ঘরে ফিরে চলে যায়,
বকের পাখায় আলোক লুকায় ছাড়িয়া পূবের মাঠ ;
দূরে দূরে গ্রামে জ্বলে উঠে দীপ—আঁধারেতে থাকে হাট !

নিশা নামে, দূরে—কোথায় না জানি, একক পেচক ডাকে :
নদীর বাতাস ছাড়ে প্রশ্বাস পার্শ্বে পাকুড়-শাখে।
হাটের দোচালা মুদিল নয়ন,
কারো তরে আর নাই আহ্বান ;
বাতাস বাজায় বিদ্রূপ-বাঁশী জীর্ণ বাঁশের ফাঁকে ;
নির্জন হাটে রাত্রি নামিল পেঁচার আর্ত ডাকে।

দিবসেতে সেথা কত কোলাহল চেনা-অচেনার ভিড়ে ;
কত না ছিন্ন চরণ-চিহ্ন ছড়ানো সে ঠাঁই ঘিরে !
মাল চেনাচেনি, দর জানাজানি,
কাণাকড়ি নিয়ে কত টানাটানি,
হানাহানি ক'রে কেউ নিল ভ'রে, কেউ গেল খালি ফিরে।
দিবসে থাকে না কথার অন্ত চেনা-অচেনার ভিড়ে !

কত কে আসিল, কত বা আসিছে, কত না আসিবে হেথা,
ও-পারের লোক নামালে পসরা ছুটে এ-পারের ক্রেতা।
শিশির-বিমল প্রভাতের ফল
শত হাতে সহি' পরখের ছল—
বিকালবেলায় বিকায় হেলায় সহিয়া নীরব ব্যথা,
হিসাব নাহি রে—এল আর গেল কত ক্রেতা-বিক্রেতা!

—যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

মায়ের প্রতিমা

ঝকঝকে নীলাকাশ সোনা-ঢালা রোদ্দুর,
ভোর হ'তে 'কাঁই না-না' আর শানায়ের সুর।
আজ পূজো সত্যি রে! এবারে যে ভাল আছি,
আর বার জ্বরে পড়ি ঠিক পূজো কাছাকাছি।
একেবারে আসে না তো, মা যে বড় দেরি করে।
সিঁদুরের দাগ বাঁশে, তারও কতদিন পরে।
সিঙ্গিটা ঠিক হ'তে কত দিন লাগে ভাই?
পাল-কাকা কেন এত দেরি করে, ভাবি তাই।
চশমাটি চোখে দিয়ে সেই চোখ-ভুরু টানা—
কতবার স'রে এসে দেখে মার মুখখানা।
যত ভাবি আর কেন? তত দেখি আরো আছে।
শেষকালে চিনি ঠিক—মা তো এই আসিয়াছে।

প্রতিবার মন থেকে ঠিক গড়ে ছবিখানি ;
পুরুতের চেয়ে আমি তাই তারে বড় মানি।
পরশু তো দিন ভ'র চিত্তির হ'ল চাল,
আঁচলা ও মটুকেতে সাজাইল মালী কাল।
আর মোটে তিন দিন, তার পর সব শেষ।
পূজো মানে শেষ করা, তার চেয়ে গড়া বেশ।
চট ক'রে গড়ে যদি রেখে দেয় তিনমাস—
প্রাণ ভরে দেখে নিই—তবে বুঝি মেটে আশ।
আগে মা'র মুখ দেখো, ভরে যায় অন্তর—
তারপর পূজোপাট যত কিছু মন্তর।

—মোহিতলাল মজুমদার

অনাবৃষ্টি

জমিতে উড়িছে ধুলো ফুলাল না শীষগুলো
গরুর খোরাক হল যেন তুচ্ছ ঘাস,
নিরাশায় ভালে হাত কৃষক জাগিছে রাত
দীর্ঘশ্বাসে তপ্ত করি তুলে অন্নগ্রাস।
জলে ভিজে রোদে পুড়ে খেটেখুটে ঘুরে ঘুরে
লাভ হইয়াছে শেষে জীর্ণজ্বরভার,
নাহিক বৈদ্যের কড়ি, রূপা নাই এক ভরি
বাঁধা দিয়া করিবে যে পথ্যের যোগাড়।

দেহ অস্থিচর্ম্মসার কেহ নাহি দেয় ধার—
মহাজন তুষ্ট নয় কেবল সেলামে,
আশ্বিনের কিস্তি বাকি গোমস্তা বলেছে ডাকি'—
না দিলে, বলদ-জোড়া চড়াবে নিলামে।
পুকুর ভরেছে পাঁকে মাছ নাই, ব্যাং ডাকে ;
জালি কাঁধে জেলে-বউ ফেরে ম্লানমুখ ;
ছেলেগুলো কি যে খাবে আঁখিজলে তাই ভাবে,
পুঁজি আছে শুধু ছুটো গুগলি শামুক।
অস্থিসার শীর্ণকায় গরু চাল টেনে খায় ;
নাহি তৃণগাছ হায় ডহরে পগারে,
কাদাজল পান ক'রে একে একে যায় ম'রে,
রোগে ভুগে ভুগে শেষে চলেছে ভাগাড়ে।
বন্ধ আজ গাই দোয়া— দেয় নাক এক পোয়া ;
যে গাই ঢালিত ছুধ ছুই-তিন কেঁড়ে।
গোয়ালাপাড়াটা গোটা খুঁজে নাহি এক ফোঁটা
মেলে ছুধ, ফাটে বুক রোগী-শিশু হেরে।
হাটে নাই সোরগোল, ঘাটে নাই কলরোল,
গোঠে বাটে মাঠে নাই নীলকণ্ঠি গান,
রোগ শোক ঘরে ঘরে— কেবা দেখে, কেবা ধরে,
যাত্রা-মহড়ায় নাই হাস্য-কলতান।
মাসে হাট আট দিন তাও ক্রমে হয় ক্ষীণ,
কিনিবার বেচিবার নাহিক কিছুই—
মাঠ শুষ্ক জলাভাবে রবি-শস্য কে লাগাবে ?
পড়ে আছে শূন্য বাদা আউশের ভূঁই।

বনে বাগে নাই ফল, এবার শিউলীতল
হয়ানক পীত-সিত ফুলে ফুলে আলা,
নিতান্ত মরণ নাই ধুতরা ফুটেছে তাই ;
পুণ্যপুকুরের তরে তুলে পল্লীবালা।
পিপাসিত পাখি অলি দেশ ছেড়ে গেছে চলি'
রাতে শুধু পেঁচা ডাকে, দিনে চিল-কাক ;
জলবিন্দু নাই ডাবে ; মধুবিন্দু কোথা পাবে ?
ফুল নাই, মৌমাছিরা রচে নি মৌচাক।
শুষ্ক নলখাগড়ায় মড়া তাল-বাগড়ায়
অফুরন্ত শরবনে উঠে হাহাকার,
ম্রিয়মাণ লতা-তরু, এদেশ হয়েছে মরু
বর্ষা-জননীর স্নেহ না লভি' এবার।

—কালিদাস রায়

জীবন ভিক্ষা

"দেউলে দেউলে কাঁদিয়া ফিরি গো দুলালে আগলি বক্ষে,
উষ্ণ বিয়োগ-উৎস-সরিতে দরবিগলিত চক্ষে—
শত চুম্বনে মেলে না নয়ন,
চুরি গেছে মোর আঁচলের ধন,
অভাগী বিহগী আজিকে আহত মরণ-শ্যেনের পক্ষে।

"স্তন-ক্ষীরধার অধরে বাছার আজি কি লেগেছে তিক্ত ?
রসনা-প্রসূন কোন্ পরসাদ-মধুরসে পরিষিক্ত।
মুখ-চম্পকে মরুর বর্ণ
শুষ্ক অধর কমল-পর্ণ—
কি পাপে আমার প্রাণের ইন্দু পীযূষ-বিন্দু-রিক্ত ?

"কোথা সে মাধুরী আধ-আধ বোলে ? কুন্দবৃন্ত-ছিন্ন,
দন্তরুচিতে কই সে কান্তি, পুণ্য হাসির চিহ্ন ?
জানি প্রভু, তব পাণির পরশে
ননীর পুতুল জাগিবে হরষে।
কোন্ পাষাণের বিষমাখা বাণে নয়নের মণি ভিন্ন ?

"অবনীর এই পদ্ম-বেদীতে হরিলে ত্রিতাপ-দুঃখ,
যাত্রা করেছ দুরগম পথে ক্ষুরধার সম সূক্ষ্ম !
দিয়ে তপোবল, মহানির্বাণ,
কুমারে আমার কর প্রাণদান।"
লুটায় জননী বুদ্ধচরণে আলুথালু কেশ রুক্ষ।

কহেন বুদ্ধ, "তনয় তোমার নীরব সমাধিমগ্ন !
বরণ করেছে চির-সুন্দর মরণের মহালগ্ন।
থাকে যদি কোথা অশোকনিলয়,
ভিখ মাগি' আন সর্ষপচয় ;
পরশে তাহার দুলিয়া উঠিবে পরাণ-মৃণাল-ভগ্ন।"

বিশাল পুরীর দ্বারে দ্বারে ঘুরে কেহ নাহি দেয় ভিক্ষা ;
নিবেদিল শেষে গুরুপদে এসে, "শিখাইলে শেষ শিক্ষা—
জীয়াতে চাহি না তনয়ে আমার,
ভবনে ভবনে ওঠে হাহাকার।
তিরোহিত ঘোর বিকার, বিতর' উপসম্পদা দীক্ষা।"

—করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়

ফুলবাগান

ফুলের বাগান সবার মনেই আছে—
ফুল ফোটাতে সবাই নাহি পারে ;
তপ্ত প্রখর হিংসা-লোভের আঁচে,
ছোট-'আমি'র আবর্জনা-ভারে,
শুকায় বাগান ফুল ফোটাবার আগে—
শ্যামল শোভায় ঈর্ষাদহন লাগে ;
শাখায় শাখায় কাঁটাই শুধু জাগে
ক্ষুদ্র মনের ব্যর্থ অহঙ্কারে।
ফুলের বাগান সবার মনেই আছে,
ফুল ফোটাতে ক'জন বল পারে!

ফুলেরা চায় মুক্ত অবকাশ,
উদার মনের সহজ আয়োজন ;
আলো বাতাস বইবে বারোমাস
আকাশ সম অবাধ হ'লে মন।
যুক্তি-বিবেকহীন অবহেলা
করছে লালন আগাছাদের মেলা,
কাটতে যে তাই যাবে সারাবেলা—
রচবে কবে ফুলের বৃন্দাবন ?
ফুলেরা চায় মুক্ত অবকাশ
আকাশ সম চায় যে উদার মন।

রাখতে সরস তৈরি-করা মাটি
চাই যে বুকে প্রেমের উৎসধার,
ভালবাসতে জানলে পরিপাটি
ফলে ফুলে সাজবে চমৎকার ;
তোমার মনের ছোট্ট বাগানখানি—
রৌদ্র দেবে বর্ণ তাতে আনি
বইবে বাতাস সৌরভেরি বাণী
ধন্য হবে নিখিল সংসার।
ভালবাসায় সরস হ'লে মাটি
মনের বাগান সাজবে চমৎকার ॥

—সজনীকান্ত দাস

ভাড়াটে কুঠি

ভাড়াটে কুঠি—
নদীর স্রোতের জঞ্জাল সম আসিয়া জুটি ॥
ওধারে তাহারা এধারে কাহারা
ওপরে ও নিচে নানা,
পাশাপাশি রোজ ঘর করি ভাই—
কেহ নয় কারো জানা।
শুধু দু'বেলায় চোখোচোখি হয়,
একই সিঁড়ি দিয়ে উঠি'।
ভাড়াটে কুঠি ॥

একটি ইটের ব্যবধান রেখে
পাশাপাশি থাকি শুয়ে ;
এ-ছাতের জল ও-ছাতে গড়ায়
ভিত গাড়া এই ভূঁয়ে।
ওইখানে শেষ ; তারপর আঁটা
জানালা কপাট দু'টি।
ভাড়াটে কুঠি ॥

একদিন ফের ঘূর্ণিতে টানে,
কোন্‌খানে যাই ভেসে ;
কিছু নাহি জানি, তবুও বিদায়
নিয়ে চলি ম্লান হেসে।
যা ছিল আড়াল রহে চিরকাল
বাধা নাহি যায় টুটি'।
ভাড়াটে কুঠি ॥

শুধু কোনদিন অঙ্গ-বিহীন
বিদ্রোহ করে প্রাণ ;
কঠিন দেয়ালে করাঘাত করে
ঘুচাইতে ব্যবধান।
ঘোচে না আড়াল, ব্যাকুল হৃদয়
মিছে মরে মাথা কুটি'।
ভাড়াটে কুঠি ॥

—প্রেমেন্দ্র মিত্র

রূপাই

এই গাঁয়ের এক চাষার ছেলে, লম্বা মাথার চুল,—
কালো মুখেই কালো ভ্রমর! কিসের রঙিন ফুল?
কাঁচা-ধানের পাতার মতো কচি মুখের মায়া;
তার সাথে কে মাখিয়ে দেছে নবীন তৃণের ছায়া!
জালি-লাউয়ের ডগার মতো বাহু দু'খান সরু;
গা'খানি তার শাঙন-মাসের যেমন তমাল-তরু।
বাদল-ধোয়া মেঘে কে গো মাখিয়ে দেছে তেল,
বিজলী-মেয়ে লাজে লুকায় ভুলিয়ে আলোর খেল্।
কচি ধানের তুলতে চারা হয়তো কোনো চাষী
মুখে তাহার ছড়িয়ে দেছে কতকটা তার হাসি।

কালো চোখের তারা দিয়েই সকল ধরা দেখি,
কালো দ'তের কালি দিয়েই কেতাব-কোরান লেখি।
জনম কালো, মরণ কালো, কালো ভুবনময়;
চাষীদের ওই কালো ছেলে সব করেছে জয়!
সোনায় যে-জন সোনা বানায়, কিসে গরব তা'র?
রঙ পেলে ভাই গড়তে পারি রামধনুকের হার।
কালোয় যে-জন আলো বানায়, ভুলায় সবার মন,
তারি পদ-রজের লাগি লুটায় বৃন্দাবন।

সোনা নহে, পিতল নহে, নহে সোনার মুখ,—
কালো-বরণ চাষীর ছেলে জুড়ায় যেন বুক।
যে-কালো তার মাঠেরি ধান, যে-কালো তার গাঁও,
সেই কালোতে সিনান করি উজল তাহার গাও।

আখড়াতে তার বাঁশের লাঠি অনেক মানে মানী,
খেলার দলে তারে নিয়েই সবার টানাটানি।
'জারী'র গানে তাহার গলা উঠে সবার আগে,
'শালসুন্দি'-বেত যেন ও, সকল কাজেই লাগে।
বুড়োরা কয়,—"ছেলে নয়, ও 'পাগাল'-লোহা যেন!
রূপাই যেমন বাপের বেটা, কেউ দেখেছ হেন?
যদিও রূপা নয়কো রূপাই,—রূপার চেয়ে দামী,
এক কালেতে ওরই নামে সব গাঁ হবে নামী।"

—জসীমউদ্দীন

রামগরুড়ের ছানা

রামগরুড়ের ছানা হাসতে তাদের মানা;
হাসির কথা শুনলে বলে,—
"হাসব না না, না না।"—
সদাই মরে ত্রাসে ঐ বুঝি কেউ হাসে;
এক চোখে তাই মিটমিটিয়ে
তাকায় আশেপাশে।

ঘুম নাহি তার চোখে আপনি ব'কে ব'কে
আপনারে কয়, "হাসিস যদি
মারব কিন্তু তোকে।"
যায় না বনের কাছে, কিংবা গাছে গাছে
দখিন-হাওয়ার সুড়সুড়িতে
হাসিয়ে ফেলে পাছে।
সোয়াস্তি নেই মনে— মেঘের কোণে কোণে
হাসির বাষ্প উঠছে ফেঁপে
কান পেতে তাই শোনে।
ঝোপের ধারে ধারে রাতের অন্ধকারে
জোনাক জ্বলে আলোর তালে
হাসির ঠারে ঠারে।
হাসতে হাসতে যারা হচ্ছে কেবল সারা,
রামগরুড়ের লাগছে ব্যথা
বুঝছে না কি তারা ?
রামগরুড়ের বাসা ধমক দিয়ে ঠাসা,
হাসির হাওয়া বন্ধ সেথায়
নিষেধ সেথায় হাসা।

—সুকুমার রায়

কুটির

ঝিকিমিকি দেখা যায় সোনালি নদীর,
ওইখানে আমাদের পাতার কুটির।
এলোমেলো হাওয়া বয়—
সারা বেলা কথা কয় ;
কাশফুলে দুলে ওঠে নদীর দু'পার,
একখানি শাড়ি যেন তৈরি রূপার !

আকাশে গড়িয়া ওঠে মেঘের মিনার,
তারি ফাঁকে দেখা যায় চাঁদের কিনার।
গাছের পাতার ফাঁকে
আকাশ যে চেয়ে থাকে ;
গুন-গুন গান গাই, চোখে নাই ঘুম,
চাঁদ যেন আমাদের নিকট-কুটুম।

নৌকোরা আসে যায় পাটেতে বোঝাই,
দেখে কি যে খুশি লাগে, কি ক'রে বোঝাই !
কত দূরদেশ থেকে
আসিয়াছে এঁকে বেঁকে,
বাদলে 'বদর' বলে' তুলিছে বাদাম,
—হাল ধরে, যেন উহা ঘোড়ার লাগাম !

এস, এস—আমাদের সোনার কুটির—
ঝিকিমিকি করে জল কাজল নদীর।
ঝিঙের মাচার 'পরে
ফিঙে ব'সে খেলা করে;
বেলা যে পড়িয়া এল, গায়ে লাগে হিম;
আকাশে সাঁঝের তারা, উঠানে পিদিম।

—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

সবার আমি ছাত্র

আকাশ আমায় শিক্ষা দিল
উদার হ'তে ভাই রে;
কর্মী হবার মন্ত্র আমি
বায়ুর কাছে পাই রে।
পাহাড় শিখায়—তাহার সমান
হই যেন ভাই মৌন মহান,
খোলা মাঠের উপদেশে
দিলখোলা হই তাই রে।
সূর্য আমায় মন্ত্রণা দেয়—
আপন তেজে জ্বলতে,
চাঁদ শিখাল—হাসতে মেদুর,
মধুর কথা বলতে।

ইঙ্গিতে তার শিখায় সাগর—
অন্তর হোক রত্ন-আকর,
নদীর কাছে শিক্ষা পেলাম—
আপন বেগে চলতে।
মাটির কাছে সহিষ্ণুতা
পেলাম আমি শিক্ষা,
আপন কাজে কঠোর হ'তে
পাষাণ দিল দীক্ষা।
ঝরনা তাহার সহজ গানেই
গান জাগালো আমার প্রাণেই,
শ্যাম বনানী সরসতা
আমায় দিল ভিক্ষা।
বিশ্বজোড়া পাঠশালা মোর,
সবার আমি ছাত্র,
নানান ভাবের নতুন জিনিস
শিখছি দিবারাত্র।
এই পৃথিবীর বিরাট খাতায়,
পাঠ্য যে সব পাতায় পাতায়,
শিখছি সে সব কৌতূহলে,
সন্দেহ নাই মাত্র।

—সুনির্মল বসু

আত্মসম্মান

তোমার জননী যিনি, তিনিই তোমার কাছে
পূজনীয়া রমণী-রতন ;
তোমার স্বদেশ জেনো ভূমণ্ডলে শ্রেষ্ঠ দেশ
নাহি কিছু তাহার মতন ;
এই গর্বে তব শির সদা যেন রহে অভ্রভেদী,
এদেরই অর্চনা লাগি' জীবনে রচিও পূজা-বেদী ;
রেখো স্থির এ-ধারণা সকল সংশয়-দ্বন্দ্ব ছেদি'
তুচ্ছ করি' উত্থান-পতন
জননী অতুলনীয়া,—জন্মভূমি শ্রেষ্ঠ ভূমি,
শিক্ষা কোরো করিয়া যতন।

মায়ের সন্তান তুমি, ভারতীয় বংশধর—
মর্মে যদি এ-চেতনা থাকে,
চিত্ত হবে তীর্থ-ভূমি, চিত্ত হবে মহানন্দ,
অতিক্রমি' সর্ব দীনতাকে।
অতিক্রমি' জীবনের শত দুঃখ বেদনা বিকার
সবিনয়ে সসম্ভ্রমে সগৌরবে করিবে স্বীকার
কি মহাদায়িত্ব তব,—কি বিরাট উত্তরাধিকার !
স্বদেশের দীপ্ত প্রতিভাকে—
দীপ্ততর করিবার তোমারই যে অধিকার,
অবহেলা করিবে না তাকে।

সম্মান করিও তারে তোমার যা আপনার,
ঝলকে যা চোখের মণিতে,
ভঙ্গিতে, ভাষায়, ভাবে, দ্যোতনায়, প্রেরণায়
সুখে দুঃখে সঙ্গীতে ধ্বনিতে।
ওতপ্রোত চিরকাল বিকশিত বিচিত্র লীলায়,
স্বদেশের সাথে যাহা নানা ছন্দে তোমারে মিলায়,
যার লাগি' ধন্য তুমি, যাহা তব মহিমা বিলায় ;
যার মন্ত্র ধ্বনিছে শোণিতে
তাহার সম্মান কোরো হৃদয়ের
শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্যে,
শ্রেষ্ঠ পুণ্য তাই ধরণীতে।

—বনফুল

সহায়

চারিধারে খোলা মাঠ, গৃহ তারি মাঝে ;
একা ঘরে, আর সবে গিয়েছেন কাজে।
জনহীন পথঘাট, অমানিশা রাতি,
আশে-পাশে কেহ নাই, পথে নাই বাতি ;
কেমন কাঁপিল মন, নিশীথ নীরব,
থেকে থেকে ওঠে দূরে শেয়ালের রব ;

জানালাটা খুলে দিয়ে অন্ধকার পথে
চুপ ক'রে আছি চেয়ে ; ভাবি, কোনোমতে
শেষ হ'লে বেঁচে যাই এই রাত্রিকাল।
হেন কালে আলো হাতে চাকর গোপাল,
রাত-কানা বুড়ো সেই, ঢুকে দালানেতে,
ছেঁড়া কাঁথাখানি তার এক ধারে পেতে,
হুয়ারের কাছে এসে, মোরে ডেকে কয়—
"গোপাল রহিল জেগে, কোরো না মা ভয়।"

—উমা দেবী

ভাইফোঁটা

আজকে আমি তো চা-টা খাব না মা, চা দিতে বারণ কর।
ভাইফোঁটা আজ, তা-ও ভুলে গেছ ? মা তুমি কেমনতরো !
বিনু-অমলুকে ফোঁটা দিব আমি, উঠেছি তাই তো ভোরে।
বাগানেতে গিয়ে দূর্বা ও ফুল এনেছি আঁচলে ক'রে।
শিউলির মালা গাঁথা হয়ে গেছে, দূর্বো হয়েছে বাছা—
স্নান-ঠান সব সেরেছি সকালে, হয়েছে কাপড় কাচা।
চন্দনটুকু ঘষা হল শেষ ; ধান চাই হু'টিখানি,—
আর কি কি চাই বলে দাও না মা, আমি কি গো সব জানি ?
ফোঁটার জোগাড় যা করেছি, দেখ, বাটায় আর কি রাখে ;
এই বেলা মাগো, বলে দাও যদি ভুল কিছু হয়ে থাকে।

চূয়া-চন্দন ঘিয়ের পিদিম, টাটকা ফুলের মালা,
নূতন আসন, ফলমূল মেওয়া, মিষ্টি সাজানো থালা।
নূতন কাপড়, নূতন চাদর,—মশলা এলাচ পান,
রূপোর রেকাবে আশীর্বাদের রেখেছি দূর্বো-ধান।
ভায়েদের আজ পরমান্নটা বোনই রেঁধে দেয়,—নয় ?
কাঁচা দুধ আর গাওয়া-ঘি মিশিয়ে গণ্ডূস দিতে হয়।
পায়স তা হ'লে রাঁধবই আমি, ওটা তো নিয়ম আছে,
সব রাঁধবার আবদার মাগো আজকে তোমার কাছে।
…খুব পারব মা, হবে না কষ্ট, পুড়বে না হাত মোটে,
দেখো মা একথা এখন যেন না বাবার কানেতে ওঠে।
খাওয়ানো দাওয়ানো চুকে গেলে সব, তখন বোলো মা তাঁকে—
অবাক হবেন নিশ্চয় বাবা, বকুনি দেবেন কা'কে ?
পশমের দুটি আসন বুনেছি,—ছাঁটাফুল কাটা শিখে,
"আশীর্বাদিকা দিদি"—এই কথা দু'রঙে দিয়েছি লিখে।
অমল-বিনুর হাতে কিছু দিলে অনেক তৃপ্তি হয় ;
কোলে-পিঠে-করা ছোট ভাই যে মা, এ মায়া যাবার নয়।
মনটা আমার সব চেয়ে বেশি ওদেরি জন্যে কাঁদে।
বিকেলবেলায় ঘুড়ি নিয়ে যেই ছেলেরা উঠত ছাদে—
বিনুর কথাই মনে হ'ত খালি, জল এসে যেত চোখে,
আড়ালে লুকিয়ে মুছতাম আমি দেখে ফেলে পাছে লোকে।

—অপরাজিতা দেবী

কেন মিছে নক্ষত্রেরা

কেন মিছে নক্ষত্রেরা আসে আর ?
কেন মিছে জেগে ওঠে নীলাভ আকাশ ?
কেন চাঁদ ভেসে ওঠে—সোনার ময়ূরপঙ্খী
অশ্বত্থের শাখার পিছনে ?
কেন ধূলো সোঁদা গন্ধে ভরে ওঠে
শিশিরের স্পর্শ পেয়ে—গুচ্ছে গুচ্ছে ফুটে ওঠে কাশ ?
খঞ্জনারা কেন নাচে ? বুলবুলি দুর্গাটুনটুনি
কেন ওড়ে মাঠে আর বনে বনে ?
আমরা যে নানা কাজ নিয়ে ব্যস্ত—ঘাটি বাঁধি—
ভালবাসি নগর ও বন্দরের শ্বাস ;
ঘাস যে বুটের নিচে ঘাস শুধু, আর কিছু নয় ;
মোটর যে সবচেয়ে বড় এই মানব জীবনে।
খঞ্জনারা নাচে কেন তবে আর—ফিঙা বুলবুলি
কেন ওড়ে মাঠে আর বনে বনে ?

—জীবনানন্দ দাশ

উষা

দিগ্বধূ স্বপনে হাসে,
মৃদুপদে উষা আসে,
চরণতরঙ্গ তার লাগে দূর পূবাকাশে।
স্ফুরিত-কমল রবে
জাগিল বলাকা সবে,
ঝলিল ধূসর ডানা শিশিরের গৌরবে।
নদীতে শীতল ধারা,
কানন মর্ম্মরহারা,
উষার দুয়ার ধরি কাঁদে হের শুকতারা।
মেঘের সীমানাগুলি
লভিল কাহার তূলি!
সুরবালা ছুঁড়িল কি পারিজাত ফুলধূলি ?
কোমল ধানের ক্ষেতে
পীত আলো ওঠে মেতে,
উদাসী শুকের ডানা চায় যেন উড়ে যেতে।
রজনীর অশ্রুকণা
নিমেষেই হ'ল সোনা,
শচীর মাল্যের লাগি' কুড়াইল দিগঙ্গনা।
মন্দাকিনী বহে ধীরে,
তারকা-বন্ধুর তীরে
হাঁসের পালক সম শীর্ণ শশী প'ল ছিঁড়ে॥

—প্রমথনাথ বিশী

ভগ্নপক্ষ

আমি নই রাজহংস—শুভ্রপক্ষ মেলে নভোনীলে
বলাকার মালা হয়ে ভুলে যাব ধরণী-সীমানা ;
অলকাবিলাসী নই—মানসের স্ফটিক-সলিলে
স্বপ্নিল কমল-বনে চঞ্চুকেলি নেই মোর জানা।
ঝড়ে-পড়া পাখি এক, কাদামাখা, ভাঙা দুই ডানা,
প্রলয়ের সন্ধিলগ্নে হারায়েছি আশ্রয়-শাখাটি,
আমার আকাশ নেই, আছে শুধু পৃথিবীর মাটি,
আর আছে ভীরু রক্তে সর্বগ্রাসী মৃত্যুর ঠিকানা।
তবু তো অমৃতমন্ত্র জপ করি ধূলির আসনে,
জানি চক্ষে আলো নেই, তবু আশা আছে মনে মনে—
এ প্রলয়-রাত্রিশেষে দেখা দেবে প্রত্যূষ নবীন,
অভিশপ্ত মৃত্যুপুরী ভেসে যাবে প্রাণের প্লাবনে।

(সংক্ষেপিত)

—জগদীশ ভট্টাচার্য

শ্রাবণ

বহুদিন পরে আজি রোগ জীর্ণ আঁখি দুটি মেলি'
হেরিলাম তোরে
শ্রাবণের ঘনঘটা এই পুঞ্জ মেঘের আড়ালে
অপূর্ব যোগিনী বেশে মুক্তকেশে আসিয়া দাঁড়ালে

নয়নের আগে মোর। ক্ষুব্ধ রুষ্ট ঊর্মিরাশি ঠেলি'
চলেছে বহিয়া শুধু,—আবিল মলিনরাশি তব
নেচে ওঠে মরণের তাণ্ডব নর্তনে নব নব।—
চিরমুক্তা, কোনো কালে ধরা দিবি নাকো
কোনো ডোরে ?

শৈশব জীবন হতে তোরে আমি দেখিতেছি নদী
পাইনাকো শেষ।
কখনো শরৎ প্রাতে পূর্ণবারি শান্ত অচঞ্চল,
কূলে কূলে কুলু কুলু গান গেয়ে বয়ে চলে জল,
কখনো বৈশাখ সাঁঝে গগনে ঘনায় মেঘ যদি
প্রলয় নর্তনচ্ছন্দে নেচে ওঠে তোমার পরান,
তোমার সলিলে বাজে তরঙ্গের ধ্বংসলীলা গান,
তোমার নয়নতলে করুণার নাহি চিহ্ন লেশ।
বালার্ক কিরণে তব দেখিয়াছি হে নদী আমার
অপরূপ হাসি।

কূলে কূলে রাশিরাশি ফুটিয়াছে পূর্ণিমা প্লাবনে
মদির কুসুম গন্ধ ভাসিয়াছে অধীর পবনে
মুগ্ধ জলরাশি তব শিহরিয়া ছুটেছে আবার।
বুকে নিয়ে ধনধান্য আঁচল সাজায়ে বনফুলে
সোহাগ-শরম লাজে মৃদুবাণী-পূর্ণা কূলে কূলে
ছুটিয়া চলেছে যেন দূরে কোন্ জনে ভালবাসি'।
আজি পুন হেরিলাম এ কী তব অভিনব রূপ
ভৈরবিণী সাজ।

গগনে মেঘের ঘটা শ্রাবণের শেষদিনে আজি
ভয়াল গৈরিক ভীম। নভোতলে ভীমাবেশে আজি',
এলায়ে ধূসর জটা—জলরাশি শ্মশান-স্বরূপ—
তুমি চলিয়াছ ছুটে। স্রোতবেগে শিহরি উঠিয়া
তড়িৎ-ত্বরিত-গতি আত্মহারা চলেছ ছুটিয়া,
ধ্বংসের প্রলয় মন্ত্র বক্ষে তব বাজিতেছে আজ ;
আজি তব দেখিতেছি নাহি দয়া করুণা নয়নে
স্নুকঠিন হিয়া।
মানব ধরিত্রী আজি আঘাতে কাঁদিবে স্নুকঠোর,
গগন ব্যথার ব্যথী ঢালিবে অঝোর আঁখিলোর,
তবু তব ক্রোধ-বহ্নি নিভিবে না আঁখির প্লাবনে।
স্রোতবেগে ক্ষুদ্রতরী ওই দূরে ঠিকরিয়া পড়ে,
তীর হতে লক্ষ নর ফুকারিয়া হাহাকার করে
নিরুপায়। ঠাঁই পাবে অতল অকূলতলে গিয়া!
অকস্মাৎ স্রোত তব রবিকরে ঝলকি' উঠিছে
ছুরিকার মতো।
এ যেন কুটিল হাস্য তব হিংস্র দন্ত ওষ্ঠ 'পরে
তব হত্যাসাধ সেথা নিষ্ঠুর নয়নে ক্ষণতরে
ব্যাঘ্রের জিঘাংসা প্রায় শান্ত স্মিত আলোকে ছুটিছে।
প্রবল দুর্বার তুমি, অত্যাচারী মদগর্বে তব,
ভাঙি গড়ি শক্তিমদে শ্যাম শোভা দেশ নব নব,
চলেছ কাটিয়া বলে ধরামাঝে আপনার পথ।
তোমার প্রবল শক্তি বাধা দিতে আছে আমাদের
স্নেহ প্রেম বুকে।

সে ক্ষীণ বাঁধন ঠেলি' হে দর্পিত চলিয়াছ বেগে
আঘাতি' কঠোর ঘাত। ব্যথিত পঞ্জরে ওঠে জেগে
দীর্ঘশ্বাস—ভগ্ন-আশা নিরুপায় দীন হতাশের।
তবু নর কাঁদে শুধু, বুকে বাঁধি' একে অপরের,
বাহিরে বিশাল বিশ্ব আপন কঠোর জালে ঘেরে,—
সে তবু বসিয়া রহে ঊর্ধ্ব-আঁখি সব সুখে দুখে।

—হুমায়ুন কবীর

স্বর্ণভস্ম

(মহাত্মা গান্ধীর মহাপ্রয়াণে)

ভস্ম তোমার ছড়িয়ে দিলেম
গঙ্গা সিন্ধু খরস্রোতে
নীল, আমাজন, হোয়াং হোতে
ছড়িয়ে দিলেম, জড়িয়ে দিলেম
সাত সাগরের অতল জলের অন্ধকারে,
নতুন প্রাণের অঙ্গীকারে।
এই যে বিরাট পতিত জমিন্ অনুর্বর
মনসাকাঁটা গুল্মে ভরা দিগন্তর,
শূন্য সকল সম্ভাবনা,
প্রাণধারণের প্রাণহরণের বিড়ম্বনা!

ভস্ম তোমার মিলিয়ে গেল স্রোতের তোড়ে
ননীর চেয়ে নরম নতুন অবাক পলির সৃষ্টি ক'রে
বসুন্ধরার বন্ধ্যাচরে
এবার বুঝি জীবন—সোনার ভস্ম ঝরে ঃ
পতিত মাটি আজকে দেখি স্বপ্নারতা
আসবে ফিরে হারানো তার উর্বরতা ;
দিগন্ত তার উঠবে জেগে
সবুজ মেখে।
ভস্ম তোমার বীজের মতোই ছড়িয়ে গেল
আকাশতলে
জলে স্থলে ॥

—দিনেশ দাশ

আগামী

জড় নই, মৃত নই, নই অন্ধকারের খনিজ ;
আমি তো জীবন্ত প্রাণ, আমি এক অঙ্কুরিত বীজ
মাটিতে লালিত ভীরু ; শুধু আজ আকাশের ডাকে
মেলেছি সন্দিগ্ধ চোখ, স্বপ্ন ঘিরে রয়েছে আমাকে।
যদিও নগণ্য আমি তুচ্ছ বটবৃক্ষের সমাজে,
তবু ক্ষুদ্র এ শরীরে গোপনে মর্মরধ্বনি বাজে।

বিদীর্ণ করেছি মাটি, দেখেছি আলোর আনাগোনা—
শিকড়ে আমার তাই অরণ্যের বিশাল চেতনা।
আজ শুধু অঙ্কুরিত, জানি কাল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাতা
উদ্দাম হাওয়ার তালে তাল রেখে নেড়ে যাবে মাথা ;
তারপর দৃপ্ত শাখা মেলে দেবো সবার সম্মুখে ;
ফোটাব বিস্মিত ফুল প্রতিবেশি গাছেদের মুখে।
সংহত কঠিন ঝড়ে, দৃঢ়প্রাণ প্রত্যেক শিকড়
শাখায় শাখায় বাধা, প্রত্যাহত হবে জানি ঝড়,
অঙ্কুরিত বন্ধু যত মাথা তুলে আমারই আহ্বানে
জানি তারা মুখরিত হবে নব অরণ্যের গানে।
আগামী বসন্তে জেনো মিশে যাব বৃহতের দলে ;
জয়ধ্বনি কিশলয়ে, সংবর্ধনা জানাবে সকলে।
ক্ষুদ্র আমি, তুচ্ছ নই ; জানি আমি ভাবী বনস্পতি—
বৃষ্টির মাটির রসে পাই আমি তারি তো সম্মতি।
সে দিন ছায়ায় এসো ; হানো যদি কঠিন কুঠারে,
তবুও তোমায় আমি হাতছানি দেব বারে বারে।
ফল দেব, ফুল দেব, দেব আনি' পাখিরও কূজন—
একই মাটিতে পুষ্ট তোমাদের আপনার জন।

—সুকান্ত ভট্টাচার্য

কবি-পরিচয়

কৃত্তিবাস ওঝা (পঞ্চদশ শতাব্দী)—জন্ম-তারিখ সম্বন্ধে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে। নদীয়া জেলার অন্তর্গত ফুলিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। কবি মুখুটি বংশীয় ব্রাহ্মণ—উপাধি ওঝা, অর্থাৎ উপাধ্যায়। অনেকের মতে কৃত্তিবাস গৌড়েশ্বর দনুজমর্দন গণেশের আদেশক্রমে 'রামায়ণ' অনুবাদ করেন।

চণ্ডীদাস (ষোড়শ শতাব্দী)—চণ্ডীদাস নামে একাধিক কবি ছিলেন। জন্মস্থান বীরভূমের নান্নুর (মতভেদে, বাঁকুড়া জেলার ছাতনা) গ্রামে। চণ্ডীদাস-ভণিতায় অনেক উৎকৃষ্ট পদ এখন অন্য কবির রচিত বলিয়া জানা গিয়াছে। তৎসত্ত্বেও যেগুলি উৎকৃষ্ট ও চণ্ডীদাস-ভণিতাযুক্ত সেগুলির কবি যে একজন শ্রেষ্ঠ গীতি-কবি, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই চণ্ডীদাসকেই অধুনা 'দ্বিজ-চণ্ডীদাস' নামে পৃথক রূপে চিহ্নিত করা হইয়াছে।

জ্ঞানদাস (ষোড়শ শতাব্দী)—শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব পদকর্তাদের অন্যতম। প্রাচীন বর্ধমান জেলার কাঁদড়া গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। 'ব্রজবুলি' ভাষায় বহু পদ রচনা করিলেও ইহার বাংলা পদগুলিই উৎকৃষ্ট।

বলরাম দাস—কবি ও পদকর্তা। জন্ম ১৫৩৭ খৃস্টাব্দে বর্ধমান জেলায় শ্রীখণ্ডের কবিরাজ বংশে। গুরুদত্ত নাম—নিত্যানন্দ দাস। পিতা—আত্মারাম দাস; তিনিও কবি ছিলেন। উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ—প্রেমবিলাস, গৌরাঙ্গাষ্টক, বীরচন্দ্রচরিত, রসকল্পসার, কৃষ্ণলীলামৃত, হাটবন্দনা, কুঞ্জভঙ্গের একুশ পদ।

আলাওল—পূর্ণ নাম আলাওল পণ্ডিত সৈয়দ। বঙ্গীয় মুসলমান কবি ও গ্রন্থকার। জন্ম—১৬২৫ খৃস্টাব্দে ফরিদপুরের ফতেয়াবাদ পরগণার অন্তর্গত জালালপুর গ্রামে। মৃত্যু—১৭শ শতাব্দীর শেষভাগে আরাকানে। গ্রন্থসমূহ—হস্তপয়কর (সপ্তপদিকর), সতী ময়না, দারাসেকন্দর নামা, পদ্মাবতী, সরকল মুল্লুক, বর্জউজ্জমাল, লোরচন্দ্রানী, তাউকা (বঙ্গানুবাদ), কৃষ্ণলীলা বিষয়ক পদাবলী।

মুকুন্দরাম চক্রবর্তী (ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ও সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ)—বর্ধমান জেলার সলিলাবাদ পরগণায় রায়না থানার অধীন দামোদর নদ-তীরবর্তী দামুন্যা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম হৃদয় মিশ্র। স্থানীয় শাসনকর্তার অত্যাচারে কবি দেশত্যাগ করিয়া আরতা গ্রামের জমিদার বাঁকুড়া রায়ের আশ্রয় গ্রহণ করেন। এইখানে বসিয়াই কবি বিখ্যাত 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্য রচনা করেন। সেকালের বাংলা ভাষার একটি প্রকৃষ্ট রূপ তাঁহার রচনায় দেখিতে পাই।

কাশীরাম দাস (ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দী)—ইনি বাংলা ভাষায় মহাভারতের আখ্যানভাগ রচনা করিয়া যশস্বী হন। ঐ 'মহাভারতের' রচনা-কাল আনুমানিক ১৬০০-১৬১০ খৃস্টাব্দ। এই কাব্যে কবির স্বকীয়তার পরিচয় রহিয়াছে। কাশীরাম দাসের জন্মস্থান বর্ধমান জেলার কাটোয়া মহকুমার অন্তর্গত সিঙ্গি গ্রামে। ইনি দেব-উপাধিক কায়স্থ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

ভারতচন্দ্র রায় (১৭১২-১৭৬০)—ব্রাহ্মণ-জমিদার বংশে ইহার জন্ম। পিতার নাম নরেন্দ্রনারায়ণ রায়; হুগলী জেলার (পূর্বে বর্ধমান) অন্তর্গত আমতার নিকট ভুরশুট পরগণার মধ্যে পেঁড়ো গ্রামে জন্ম। পরে পৈতৃক বাসস্থান ত্যাগ করিয়া নদীয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আশ্রয়ে আসিয়া বাস করেন এবং উৎকৃষ্ট কাব্য রচনা করিয়া শ্রেষ্ঠ কবিরূপে সম্মানিত হয়। কৃষ্ণচন্দ্র কবিকে 'রায়গুণাকর' উপাধি প্রদান করেন। কাব্যগুলির মধ্যে 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যই বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত (১৮১২-১৮৫৯)—নদীয়া জেলার কাঁচড়াপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। 'সংবাদ প্রভাকর' নামক বিখ্যাত পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। এই 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকায় পরবর্তী যুগের কয়েকজন বিখ্যাত লেখক—বঙ্কিমচন্দ্র, দীনবন্ধু প্রভৃতির—সাহিত্যচর্চা আরম্ভ হইয়াছিল।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত—১৮২৪ খৃস্টাব্দের ২৫শে জানুয়ারি যশোহর জেলার অন্তর্গত সাগরদাঁড়ি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম রাজনারায়ণ দত্ত। প্রথম রচনা 'Captive Lady', 'Visions of the Past'; দুইখানি কাব্যই ইংরেজি। বাংলা-ভাষায় প্রথমে তিনি নাটক রচনা করেন, এবং পরে

১৮৬১ খৃস্টাব্দে তাঁহার তিনখানি উৎকৃষ্ট কাব্য—মেঘনাদ বধ, ব্রজাঙ্গনা ও বীরাঙ্গনা প্রকাশিত হয়। ইউরোপে অবস্থান-কালে তিনি 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'র অধিকাংশ রচনা করেন। তিনি বাংলা ও ইংরেজি ছাড়া সংস্কৃত, তামিল, তেলেগু, হিব্রু, গ্রীক, ল্যাটিন, ফরাসি ও ইটালিয়ান ভাষা আয়ত্ত করিয়াছিলেন। ঋণগ্রস্ত ও রোগগ্রস্ত হইয়া অশেষ কষ্ট ভোগ করিয়া মধুসূদন ১৮৭৩ খৃস্টাব্দের ২৯শে জুন আলিপুরের দাতব্য চিকিৎসালয়ে দেহত্যাগ করেন।

বিহারীলাল চক্রবর্তী (১৮৩৫-১৮৯৪)—কলিকাতার নিমতলা পল্লীতে জন্ম হয়। 'সারদামঙ্গল' তাঁহার শ্রেষ্ঠ কাব্য। বিহারীলালকে নব্য গীতিকবিতার প্রবর্তক বলা যাইতে পারে ; সেই হিসাবে বাংলা কাব্যের ইতিহাসে তাঁহার একটি অতি উচ্চ স্থান নির্দিষ্ট হইয়া আছে।

সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার (১৮৩৭-১৮৭৮)—যশোহর জেলার অন্তর্গত ভৈরব নদের তীরবর্তী জগন্নাথপুর ইঁহার জন্মভূমি। ইনি বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ-বংশে জন্মগ্রহণ করেন। বাংলা কাব্যের নবযুগের কবিগণের মধ্যে ইনি অন্যতম। 'মহিলা কাব্য' ইঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা।

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৯০৩)—বঙ্কিমচন্দ্রকে কেন্দ্র করিয়া সে যুগে একটি সাহিত্যিক গোষ্ঠী গড়িয়া উঠিয়াছিল—কবি হেমচন্দ্র তাঁহাদের অন্যতম। হুগলী জেলায় রাজবলহাট নামক গ্রামে ইঁহার জন্ম। ইঁহার রচিত 'বৃত্রসংহার কাব্য' বিখ্যাত মহাকাব্য। চিন্তা-তরঙ্গিণী, বীরবাহু প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থও উল্লেখযোগ্য। কবি শেষ বয়সে অন্ধদশায় অত্যন্ত কষ্ট ভোগ করেন।

নবীনচন্দ্র সেন (১৮৪৬-১৯০৯)—বাংলা ১২৫৩ সালে চট্টগ্রাম জেলার নয়াপাড়া গ্রামে জন্ম হয়। ১২৬৮ সালে বি.এ. পাশ করিয়া ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হন। নবীনচন্দ্র নূতন যুগের মহাকবিগণের অন্যতম। তাঁহার ভাষা অতিশয় প্রাঞ্জল এবং ছন্দও মধুর-গম্ভীর। কাব্যগুলির মধ্যে 'পলাশির যুদ্ধ' একটি উৎকৃষ্ট রচনা। রৈবতক, কুরুক্ষেত্র, প্রভাস, অমিতাভ ইত্যাদিও বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

গোবিন্দচন্দ্র দাস (১৮৫৫-১৯১৮)—ঢাকা জেলার ভাওয়ালের বিখ্যাত কবি। ভাওয়ালের অন্তর্গত জয়দেবপুর গ্রামে বাংলা ১২৭১ সালের ৪ঠা মাঘ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি স্বভাব-কবি ছিলেন। জীবনের দুঃখ-কষ্টের সঙ্গে তাঁহাকে শোকতাপ এবং নিদারুণ উৎপীড়ন সহ করিতে হইয়াছিল। কাব্যগুলির মধ্যে—কুঙ্কুম, কস্তুরী, প্রেম ও ফুল এবং বৈজয়ন্তী প্রধান।

গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী (১৮৫৭-১৯২৪) বাংলা সাহিত্যের মহিলা কবিদের মধ্যে বিশিষ্টস্থানের অধিকারিণী। জন্ম—১৮৫৭ খৃস্টাব্দের ১৮ই আগস্ট; মৃত্যু —১৯২৪ খৃস্টাব্দের ১৪ই আগস্ট। স্বামী বৌবাজার নিবাসী নরেন্দ্রচন্দ্র দত্ত। গ্রন্থ—অশ্রুকণা, ভারতকুসুম, সন্ন্যাসিনী, শিখা, অর্ঘ, আভাষ, সিন্ধুগাথা, স্বদেশিনী প্রভৃতি। ইনি 'জাহ্নবী' নামক একটি সাময়িক পত্রিকার সম্পাদিকা (১৩১৪-১৫) ছিলেন। গিরীন্দ্রমোহিনীর কাব্যের উজ্জ্বল গার্হস্থ্যচিত্র পরম উপভোগ্য।

কামিনী রায় (১৮৬৪-১৯৩৩)—বরিশাল জেলার অন্তর্গত বাসণ্ডা গ্রামে জন্ম। বিখ্যাত ঐতিহাসিক লেখক চণ্ডীচরণ সেনের কন্যা ও সেসন্স-জজ কেদারনাথ রায়ের পত্নী। বাংলার মহিলা-কবিগণের মধ্যে ইঁহার স্থান খুব উচ্চে। ইঁহার রচিত কাব্যগুলির মধ্যে 'আলো ও ছায়া' সর্বশ্রেষ্ঠ।

দেবেন্দ্রনাথ সেন (১৮৫৪-১৯২০)—পিতা লক্ষ্মীনারায়ণ সেন হুগলী জেলার বলাগড় গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ সম্ভবত গাজীপুরে জন্মগ্রহণ করেন। কর্মোপলক্ষে যুক্ত-প্রদেশের একাধিক স্থানে বাস করিয়াছেন। তন্মধ্যে এলাহাবাদই প্রধান; দেবেন্দ্রনাথ এইখানে ওকালতি করিতেন। আধুনিক গীতিকবিগণের মধ্যে দেবেন্দ্রনাথের একটি অতি উচ্চ স্থান আছে। তাঁহার কাব্য-সংগ্রহের মধ্যে 'অশোকগুচ্ছ' সর্বোৎকৃষ্ট। অন্যান্যগুলির নাম—পারিজাত-গুচ্ছ, শেফালিগুচ্ছ, অপূর্ব ব্রজাঙ্গনা, অপূর্ব বীরাঙ্গনা প্রভৃতি।

অক্ষয়কুমার বড়াল (১৮৬০-১৯১৯)—রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক কবি। ইঁহার কাব্যগ্রন্থগুলির মধ্যে 'এষা' সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। অপর কয়েকখানি কাব্যের নাম—প্রদীপ, কনকাঞ্জলি, শঙ্খ। ইনি কবি বিহারীলাল চক্রবর্তীর কাব্য-শিষ্য ছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১)—১২৬৮ বঙ্গাব্দের ২৫শে বৈশাখ কলিকাতার বিখ্যাত ঠাকুরবংশে জোড়াসাঁকোর বাড়িতে জন্ম হয়। পিতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর; পিতামহ প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর। পনের বৎসর বয়সে তাঁহার প্রথম কাব্য 'বনফুল' প্রকাশিত হয়। সতের বৎসর বয়সে শিক্ষালাভের জন্য প্রথম বিলাতযাত্রা করেন। সেই সময় হইতে 'ভারতী' পত্রিকায় বহু বিষয়ে প্রবন্ধ লিখিয়া খ্যাতিলাভ করেন। ইহার পর সারাজীবন ধরিয়া ক্রমাগত কাব্য, নাটক, উপন্যাস, প্রবন্ধ প্রভৃতি প্রকাশ করিতে থাকেন। ১৮৯১ অব্দে বিখ্যাত মাসিকপত্র 'সাধনা' প্রকাশ করেন। ১৯০০-১৯০১ অব্দে বোলপুরে শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন এবং নবপর্যায় 'বঙ্গদর্শনের' সম্পাদক হন। ১৯১৩ অব্দে নোবেল-প্রাইজ পান 'গীতাঞ্জলি' কাব্যের জন্য। ১৯১৫ অব্দে 'নাইট' পদবী লাভ করেন; ১৯১৯ অব্দে জালিয়ানওয়ালাবাগ-হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ স্বরূপ ঐ পদবী পরিত্যাগ করেন। ১৯২১ অব্দে 'বিশ্বভারতী' ও পরবৎসর 'শ্রীনিকেতন' প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৩০ অব্দে একাদশতম বিদেশ-ভ্রমণে বাহির হন ও ইউরোপে নিজের অঙ্কিত চিত্র প্রদর্শন করেন। ইতিপূর্বে তিনি চীন, জাপান, আমেরিকা-যুক্তরাষ্ট্র, দক্ষিণ-আমেরিকা এবং বহির্ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে পর্যটন করিয়াছিলেন; ইহার মধ্যে অনেক জায়গায় একাধিক বারও গমন করেন। ১৯৩২ অব্দে পারস্য-সম্রাটের আমন্ত্রণে আকাশযানে তিনি পারস্যদেশে যান। ১৯৪১ অব্দে ৭ই আগস্ট, কিঞ্চিদূর্ধ্ব ৮০ বৎসর বয়সে, কবি পরলোকগমন করেন। রবীন্দ্রনাথ বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ কবি এবং ভারতের মহাকবিগণের অন্যতম। বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের দান অতুলনীয়। তিনি বাংলা ভাষা ও বাংলা ছন্দের এমন এক বিচিত্র রূপ দিয়াছেন, যাহার ফলে বাংলা ভাষা ও বাংলা সাহিত্যের সকল প্রকার দৈন্য ঘুচিয়াছে।

রজনীকান্ত সেন (১৮৬৫-১৯১০)—ইনি প্রধানত গান রচনা করিয়া প্রতিভার পরিচয় দিয়াছিলেন। ইঁহার রচিত গান একদা বাংলার নরনারীর মুখে মুখে ফিরিত। বাণী, কল্যাণী (১৩১১), অমৃত (১৩১৭) ইত্যাদি কাব্যে ইঁহার গান ও কবিতা সঙ্কলিত আছে।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১৮৬৩-১৯১৩)—বিখ্যাত কবি ও নাট্যকার। পিতা কার্তিকেয়চন্দ্র রায় কৃষ্ণনগরের মহারাজার দেওয়ান ছিলেন। দ্বিজেন্দ্রলাল ১৯২১ সালে এম. এ. পাশ করার পর স্টেট-স্কলারশিপ পাইয়া বিলাত হইতে কৃষিবিদ্যা শিক্ষা করিয়া আসেন; পরে ডেপুটি-ম্যাজিস্ট্রেট হন। তাঁহার হাস্যরসের রচনাগুলিতে একটি নূতন সুর ও ভঙ্গি আছে; হাসির গানগুলিই তাঁহার শ্রেষ্ঠ কীর্তি। মন্দ্র, আলেখ্য ও আষাঢ়ে—এই তিনখানি কাব্যে তিনি অতুল কবিত্বশক্তির পরিচয় দিয়াছেন।

যতীন্দ্রমোহন বাগচী (১৮৭৮-১৯৪৮)—নদীয়া জেলার জমসেরপুরের সম্ভ্রান্ত বাগচী পরিবারে যতীন্দ্রমোহনের জন্ম হয়। পিতার নাম হরিমোহন বাগচী। তিনি অধুনালুপ্ত 'মানসী' ও 'যমুনা'—দুইখানি পত্রিকার সম্পাদকতাও করিয়াছিলেন। কাব্যগুলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—রেখা, লেখা, অপরাজিতা, জাগরণী, নাগকেশর, নীহারিকা, মহাভারতী ও পাঞ্চজন্য।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (১২৮৮-১৩২৯)—বিখ্যাত গদ্য-লেখক অক্ষয়কুমার দত্তের পৌত্র; পিতার নাম রজনীনাথ দত্ত। খাঁটি বাংলা ভাষা ও বাংলা ছন্দের প্রতি তাঁহার বিশেষ অনুরাগ দেখা যায়; এই দুই বিষয়ে তিনি অসামান্য রচনা-কৌশলের পরিচয় দিয়াছেন। সত্যেন্দ্রনাথের কাব্যগুলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—তীর্থ-সলিল, কুহু ও কেকা, অভ্র-আবীর, মণিমঞ্জুষা, বিদায়-আরতি ও বেলাশেষের গান।

কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯)—কবির জন্মস্থান বর্ধমান জেলার চুরুলিয়া গ্রামে। প্রথম-মহাযুদ্ধের সময়ে অতি অল্প বয়সে তিনি 'বেঙ্গল রেজিমেণ্ট' নামক বাঙালি পল্টনে যোগদান করেন এবং 'হাবিলদার' পদ লাভ করেন। যুদ্ধ শেষে তিনি 'মোসলেম ভারত' নামক একখানি সাহিত্য-পত্রিকায় কবিতা প্রকাশ করিতে থাকেন। সেই কবিতাগুলির আশ্চর্য ছন্দোনৈপুণ্য ও প্রবল কবিত্বপূর্ণ আবেগ সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কবি নজরুলের কবিতায় প্রাচীন সমাজের নানা বিজীর্ণ সংস্কার ও নির্জীব আচার এবং পরাধীনতার বন্ধন ছিন্ন করার প্রবল আকাঙ্ক্ষা অতিশয় দৃপ্ত ও অধীর ছন্দে বাজিয়া উঠিয়াছিল; তাই

তিনি এত জনপ্রিয়। কবি নজরুলের বহু কাব্যগ্রন্থের মধ্যে এইগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য—অগ্নিবীণা, বিষের বাঁশী, দোলনচাঁপা, সিন্ধু-হিল্লোল, ছায়ানট, বুলবুল।

কুমুদরঞ্জন মল্লিক (১৮৮২)—বর্ধমান জেলার 'উজানী' গ্রামে জন্ম। ইনি দীর্ঘকাল মাথরুন (বর্ধমান) উচ্চ ইংরাজি ইস্কুলের প্রধান-শিক্ষক ছিলেন, এখন অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। অজয়, উজানী, একতারা, নূপুর, বনতুলসী, বনমল্লিকা প্রভৃতি বহু কাব্য রচনা করিয়াছেন।

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত (১৮৮৭-১৯৫৪)—১৮৮৭ খৃস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। শিবপুর বি. ই. কলেজ হইতে ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করিবার পর বাংলার নানাস্থানে কর্ম ব্যপদেশে অবস্থান করেন। প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'মরীচিকা'র (১৩৩০) মাধ্যমে বাংলা কাব্যজগতে একটি নূতন ভাবধারার প্রবর্তন করিয়া বিশিষ্টতার পরিচয় দেন। দুঃখবাদী কবিরূপেই ইঁহার খ্যাতি। কাব্যগ্রন্থ—মরীচিকা, মরুশিখা, মরুমায়া, সায়ম্‌, ত্রিযামা, অনুপূর্বা ইত্যাদি।

সুকুমার রায় (১৮৮৭-১৯২৩)—বাংলা শিশু-সাহিত্যে অপূর্ব হাস্যরসের শক্তিমান স্রষ্টা। ১৯২৩ সালে মাত্র ৩৬ বছর বয়সে পরলোকগমন করেন। প্রথম কবিতা 'ঘড়ি' প্রকাশিত হয় তৎকালীন বিখ্যাত কিশোর পত্রিকা 'মুকুল'-এর পৃষ্ঠায়। তখন কবির বয়স মাত্র আট বছর। পিতা উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী। সুকুমার রায় বি. এস. সি. পাশ করিবার পর ইংলণ্ডে গমন করিয়া মুদ্রণকার্য সম্বন্ধে ডিপ্লোমা লাভ করেন (১৯১১-১২)। গ্রন্থ—আবোল-তাবোল, খাই-খাই, হ-য-ব-র-ল, পাগলা দাশু, ঝালাপালা ইত্যাদি।

মোহিতলাল মজুমদার (১৮৮৮-১৯৫২)—জন্ম ১২৯৫ বঙ্গাব্দে ১১ই কার্তিক নদীয়া জেলার কাঁচড়াপাড়া গ্রামে (মাতুলালয়ে)। পৈতৃক নিবাস হুগলী জেলার বলাগড়। ১৩৩৫ সনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন। প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'স্বপনপসারী' (১৩২৮)। অন্যান্য কাব্যগ্রন্থ—বিস্মরণী, স্মরগরল, ছন্দচতুর্দশী ইত্যাদি। ইনি আধুনিক সমালোচনা-রীতির পথপ্রদর্শক ও ইউরোপীয় কাব্য-বিচাররীতির পরিচায়ক। 'সত্যসুন্দর দাস' এই

ছদ্মনামে বহু সাহিত্য-বিষয়ক রচনা লিখিয়াছেন। মৃত্যু ১৩৫৯ সনের ১৩ই শ্রাবণ।

কালিদাস রায় (১৮৮৯)—বর্ধমান জেলার কড়ুই গ্রামে জন্ম। বিখ্যাত বৈষ্ণব কবি লোচনদাস ঠাকুর ইঁহার পূর্বপুরুষ। ইনি কুন্দ, কুশলয়, পর্ণপুট, বল্লরী, ব্রজবেণু, ঋতুমঙ্গল, রসকদম্ব, হৈমন্তী, বৈকালী প্রভৃতি বহু কাব্য রচনা করিয়াছেন।

করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৭৭-১৯৫৫)—নদীয়া জেলার শান্তিপুর শহরে ইঁহার জন্ম। সাক্ষাৎ রবীন্দ্র-শিষ্যগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। ইঁহার রচিত কাব্যগ্রন্থ—প্রসাদী, ঝরাফুল, শান্তিজল, ধান-দূর্বা ইত্যাদি।

জসীম উদ্দিন (১৯০৩)—জন্মস্থান তাম্বুলখানা—ফরিদপুর শহর হইতে ১৬ মাইল দূরে। পৈতৃক বাসস্থান উক্ত জেলার গোবিন্দপুর গ্রাম। ইনি বাংলার পল্লী-জীবন ও পল্লী-প্রকৃতির সহিত মনে প্রাণে যুক্ত হইয়া আছেন। কাব্যগুলির মধ্যে রাখালী, বালুচর, ধানক্ষেত, রঙিলা নায়ের মাঝি, নক্সী কাঁথার মাঠ, সোজন বাদিয়ার ঘাট ইত্যাদি প্রধান।

প্রেমেন্দ্র মিত্র (১৯০৪)—ইনি ১৯০৪ অব্দে বারাণসীতে জন্মগ্রহণ করেন। প্রথম কবিতার বই 'প্রথমা'। অন্যান্য কাব্যগ্রন্থ—সম্রাট ও ফেরারী ফৌজ। আধুনিক কবিগণের অগ্রগণ্য। ইঁহার কবিতার বৈশিষ্ট্য অবহেলিত ও অপাংক্তেয় মানব-সমাজের প্রতি গভীর মমত্ববোধ, এবং সর্বোপরি মানবিকতা।

সজনীকান্ত দাস (১৯০০)—ইনি ১৯০০ সালে ২৫শে আগস্ট মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯২২ সালে বি. এস. সি. পাশ করিয়া এম. এস. সি. পড়িতে পড়িতে পরীক্ষার অব্যবহিতকাল পূর্বে 'শনিবারের চিঠি' পত্রিকায় যোগদান করেন। এখন ইনি ঐ পত্রিকার সম্পাদক ও সত্ত্বাধিকারী। প্রথম কবিতার বই—'পথ চলতে ঘাসের ফুল' (১৩৩৬)। তাঁহার অন্যান্য কাব্যগ্রন্থগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য—রাজহংস, মনোদর্শন, কেডস ও স্যাণ্ডাল, পঁচিশে বৈশাখ, মানস সরোবর, আলো-আঁধার ইত্যাদি। ইনি কয়েকখানি উপন্যাস ও গল্পপুস্তক রচনা ও সাহিত্য-বিষয়ক বহু পুস্তক সম্পাদনা করিয়াছেন।

জীবনানন্দ দাশ (১৮৯৯-১৯৫৪)—রবীন্দ্রোত্তর যুগের অন্যতম শক্তিমান কবি। ১৩০৫ বঙ্গাব্দে বরিশাল শহরে জন্মগ্রহণ করেন। বরিশাল ব্রজমোহন ইস্কুলে ও ব্রজমোহন কলেজে শিক্ষালাভ করেন; পরে প্রেসিডেন্সী কলেজে বি.এ. ও এম. এ. পড়েন। পিতা সত্যানন্দ দাশ শিক্ষাবিদ ছিলেন। মাতা কুসুমকুমারী দাশ কবি হিসাবে সুপরিচিত ছিলেন। জীবনানন্দের প্রথম কবিতার বই—'ঝরা-পালক'। কাব্যগ্রন্থগুলির মধ্যে 'বনলতা সেন' শ্রেষ্ঠ। 'সাতটি তারার তিমির' এবং 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'ও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আকস্মিক দুর্ঘটনায় মৃত্যু ঘটে। 'জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা' পুস্তকটি ভারত কেন্দ্রীয় সরকারের সাহিত্য আকাদামী পুরস্কার (১৯৫৪-৫৫) লাভ করিয়াছে।

বনফুল (১৯০০)—প্রকৃত নাম, বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়। ১৩০৬ বঙ্গাব্দে পূর্ণিয়া জেলার মণিহারী গ্রামে জন্ম। আদিবাস—হুগলী জেলার শিয়াখালায়। ১৯১৮ অব্দে 'প্রবাসী'তে তাঁর কবিতা প্রথম প্রকাশিত হয়; কাব্যচর্চার ভিতর দিয়াই সাহিত্যিক জীবনের প্রথম সূচনা। ঔপন্যাসিক হিসাবে খ্যাতি অর্জন করিলেও কবিতা চমৎকার লেখেন। কাব্যগ্রন্থের মধ্যে 'করকমলেষু' উল্লেখযোগ্য। ভাগলপুরেই বসবাস ও চিকিৎসা ব্যবসা করেন।

উমা দেবী—মহিলা কবি। কাব্যগ্রন্থগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য—বাতায়ন, কাজলী।

অপরাজিতা দেবী—মহিলা কবি। কাব্যগ্রন্থ—পুরবাসিনী, বুকের বীণা, বিচিত্ররূপিণী, আঙিনার ফুল ইত্যাদি।

প্রমথনাথ বিশী (১৯০২)—জন্ম ১৯০২ অব্দে রাজশাহী জেলায় জোয়াড়ী গ্রামে। শিক্ষা—শান্তিনিকেতনে। রিপন কলেজ ও শান্তিনিকেতনে অধ্যাপনা করিতেন; বর্তমানে অধ্যাপনা করেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। গল্প, প্রবন্ধ, উপন্যাস ও নাটক রচনায় সিদ্ধহস্ত। কাব্যগ্রন্থের মধ্যে—হংসমিথুন, প্রাচীন আসামী হইতে, প্রাচীন পারসীক হইতে প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

হুমায়ুন কবীর (১৯০৬)—ইনি ১৯০৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ফরিদপুরে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা এ. কে. কবিরউদ্দিন মহম্মদ (খান বাহাদুর)।

বর্তমানে ইনি কেন্দ্রীয় শিক্ষা-বিভাগের সেক্রেটারী। কাব্যগ্রন্থ—স্বপ্নসাধ, সাথী প্রভৃতি।

জগদীশ ভট্টাচার্য (১৯১১)—১৩১৮ বঙ্গাব্দে শ্রীহট্টে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম যামিনীকান্ত ভট্টাচার্য। কাব্যগ্রন্থ 'অষ্টাদশী' ও 'ক্ষণশাশ্বতী'। বর্তমানে কলিকাতা বঙ্গবাসী কলেজে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক।

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত (১৯০৩)—১৩১১ সালের ২রা আশ্বিন নোয়াখালিতে জন্ম। প্রথম কবিতা 'প্রবাসী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় (১৩২৮ বঙ্গাব্দ)। এম. এ. ও আইন পাশ করিয়া ১৯৩১ সালে বাংলা গভর্নমেণ্টের বিচার-বিভাগে কর্মগ্রহণ করেন। কাব্যগ্রন্থ—অমাবস্যা, প্রিয়া ও পৃথিবী, নীল আকাশ ইত্যাদি।

সুনির্মল বসু (১৯০২)—জন্ম ১৯০২ সালের জুলাই মাসে (বঙ্গাব্দ ১৩০৯) গিরিডিতে। পিতার নাম পশুপতি বসু ঠাকুর। ইঁহার পৈতৃক নিবাস পূর্ববঙ্গের ঢাকা জেলার অন্তর্গত বিক্রমপুর পরগণায় মালখাঁনগর। প্রথম কবিতা ছাপা (চন্দ্রভায়ের পদ্মাপার) হয় 'প্রবাসী' পত্রিকার 'ছোটদের পাততাড়ি' বিভাগে। প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ 'পাতার ভেঁপু'। কাব্যগ্রন্থ—হট্টগোল, হাওয়ার দোলায়, হুলুস্থূল, হাসি কান্নার দেশে, কিশোর আবৃত্তি, কেবল হাসির দেশে, টুনটুনির গান ইত্যাদি।

দিনেশ দাশ (১৯১৫)—ইনি ১৯১৫ অব্দের সেপ্টেম্বর মাসে কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। পিতা হৃষীকেশ দাশ। ১৯৩৪ অব্দে 'দেশ' পত্রিকায় প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয়। কাব্যগ্রন্থ—কবিতা (প্রকাশ ১৩৪৯), ভুখ মিছিল (১৩৫১), দিনেশ দাশের কবিতা (১৩৫৮) ও অহল্যা (১৩৬১)।

সুকান্ত ভট্টাচার্য (১৯২৫-১৯৪৭)—কিশোর বয়সেই ইঁহার আশ্চর্য কবি-প্রতিভার স্ফুরণ হয়। এত কম বয়সে এ রকম বলিষ্ঠ চিন্তাধারা ও প্রকাশ-শক্তি খুব অল্প কবির জীবনেই দেখা গিয়াছে। কাব্যগ্রন্থ—ছাড়পত্র, ঘুম নেই, পূর্বাভাস ও মিঠে-কড়া।